ক্ষমা যদি পেতে চাও

জুলফিকার আহমদ নকশেবন্দী

ক্ষমা যদি পেতে চাও

মূল

মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ ইমরান

মুহাম্মাদ ইরফান

মাহমুদিয়া লাইব্রেরী

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

ক্ষমা যদি পেতে চাও

প্রকাশক : মাওলানা হাবীবুর রহমান
মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০)
বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল- ০১৯৭৮-০২২০৭৯

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০ইং

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস : তরজমা কম্পিউটার
আশরাফাবাদ-১২১১, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

মূল্য ঃ ২৮০.০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ইসলাম	....	১৩
আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি	....	১৩
আয়াতের শানে নুযুল	....	১৪
আয়াতের মাকসাদ	....	১৫
ক্ষমার প্রথম শর্ত	....	১৫
জীবন যাপনে ইসলাম ধর্মপ্রাণ তুল্য	....	১৫
অন্তরসমূহ জোড়া লাগানোর গাম	....	১৮
গতানুগতিক মুসলমান বনাম স্বেচ্ছায় ও পাক্কা মুসলিম	....	১৯
মাথার চুল থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত আমরা মুসলমান	....	১৯
ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট	....	২০
পবিত্রতার ধর্ম	....	২০
নামাযের জন্য অযু আবশ্যক	....	২১
গোসলের নির্দেশ	....	২২
পরিপাটি হয়ে মসজিদের যাওয়ার নির্দেশ	....	২২
ইসলাম ও পারিবারিক জীবন	....	২২

সন্তানের সাথে পিতা মাতার সম্পর্ক

সন্তানের প্রতি স্নেহ	....	২৩
মা-বাবার সম্মান	....	২৩
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা	....	২৪
স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক	....	২৫
ইসলাম কল্যাণকামিতার ধর্ম	....	২৬
কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে প্রতিদান	....	২৬
কোরআনে পিপিলিকার কল্যাণকামিতার আলোচনা	....	২৭
সবই কল্যাণকামিতা	....	২৭
একটি মাছির কল্যাণকামিতার কারণে পুরস্কার লাভ	....	২৭
সকলের প্রতি কল্যাণকামিতা	....	২৮
ইসলাম ও সেবার অনুপ্রেরণা	....	২৯

আকাবিরদের ঘটনাবলী ২৯
চিন্তা করে দেখুন ৩০
ইসলাম ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অনুপ্রেরণা ৩০
সততার ধর্ম ৩২
মুসলমানরা হেরে গেছে ইসলাম জিতে গেছে ৩২
লজ্জা নারীর ভূষণ ৩৪
লজ্জাহীনতার ফলাফল ৩৪
ইসলামে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার শিক্ষা ৩৪
ইসলাম প্রীতি প্রকৃত থাকা চাই ৩৬
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৩৬

দ্বিতীয় শর্ত

ঈমান ৩৮
ক্ষমার প্রতিশ্রুতি ৩৮
মাগফিরাতের দ্বিতীয় শর্ত ঈমান ৩৯
ঈমানের মূল্য ৪০
সবেচেয়ে দামী জিনিস ৪০
পার্থিব স্বাদ ও চাকচিক্যের হাকীকত তথা বাস্তবতা ৪১
সন্দেহ আর ঈমান এক নয় ৪১
ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হওয়া উচিত ৪১
সাক্ষ্যদানের পুরস্কার ৪৩
না দেখে মানার নাম ঈমান ৪৪
না দেখে ব্যবসা ৪৫
জান্নাতের চাবি ও তার দাঁত ৪৭
পার্থিব প্রবঞ্চনা ৪৭
যুক্তি ও শরীয়ত ৪৭
সম্ভবনাময় বিভিন্ন কারণ ও নিশ্চিত কারণ ৪৮
দান সদকার দ্বারা সম্পদ বাড়ার ইয়াকীন ৪৮

সততায় সম্মান বাড়ে	৪৯
আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা	৪৯
হযরত মূসা আঃ-এর একটি দৃষ্টান্ত	৪৯
আল্লাহর ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে	৫২

আকাবিরদের পূর্ণ ইয়াকীনের ঘটনাবলি

দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতি অষ্ট	৫৩
ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছেন	৫৩
আমাদের অবস্থা	৫৪
পাপের ক্ষতি	৫৫
বালা-মসীবত থেকে মুক্তির উপায়	৫৫
ঈমান থেকে মাহরুম হওয়া	৫৬
কেমন ইয়াকীন থাকা চাই	৫৬
হে আল্লাহ, আমাদের ঈমান বাঁচান	৫৭
ফেরাউনের যাদুকরদের ঈমান	৫৯
বিবি আসিয়ার ঈমান	৫৯
ঈমানের মূল্য	৬০

তৃতীয় শর্ত

আনুগত্য	৬২
মাগফিরাতের তৃতীয় শতদু'প্রকারের মহিলা	৬৩
পুরুষ ঘরের নেতা	৬৪
হুজ্জতবাজীর ক্ষতি	৬৪
যেমন কর্ম তেমন ফল	৬৫
শয়তানের রাস্তা	৬৬
হযরত আদম আ.-এর তরীকা	৬৬
অবাধ্যতা একটি রোগ	৬৭

আনুগত্যের পুরস্কার ৬৮
আনুগত্যের অঙ্গীকারকুনূত শব্দের দ্বিতীয় অর্থ ইখলাস ৬৯
লোক দেখানোর বিপদ ৬৯
মানুষ ও খুশি হয় না ৭০
লোক দেখানো আমলের প্রতিদান থাকে না ৭১
মূল কাজ ও প্রতিকার ৭২
মুখলীস বান্দা কে? ৭২
একটি আশ্চর্য বিষয় ৭৩
খালেস দ্বীনই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ৭৩
আমার সম্মানিত মায়ের ভাল কাজ লোকানোর অভ্যাস ৭৪
নেকি লোকানো উচিত ৭৬
আমলের কোয়ালিটি যাচাই ৭৭
সারকথা ৭৮
হযরত নূহ আঃ-এর আনুগত্য ৭৯

চতুর্থ শর্ত

সাদাকাত/সততা ৮১
মাগফিরাতের চতুর্থ শর্ত ৮১
সত্যবাদী লোক কারা ৮২
মিথ্যা বলার স্থান ৮২
সত্যে সম্মান রয়েছে ৮২
মুসতাজাবুদ দাওয়াত কিভাবে হবে? ৮৩
সত্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলে ৮৩
এক ওকীলের সত্যের উপর অবিচলতা ৮৪
সত্যেই মুক্তি ৮৬
বাচ্চাদের মাঝে সত্য বলার অভ্যাস সৃষ্টি করুন ৮৭

পঞ্চম শর্ত

ধৈর্য ৮৮
মাগফীরাতের পঞ্চম শর্ত ৮৮
ধৈর্যের নেকি অসংখ্য ৮৯
ধৈর্যের তিনটি পর্যায় রয়েছে ৮৯
ধৈর্য আলো ছড়ায় ৯০
দুনিয়া পরীক্ষার হল ৯০
الحمد لله এর স্বাদ ৯১

ধৈর্যের স্তর

প্রথম স্তর ৯৩
দ্বিতীয় স্তর ৯৩
বিপদে মানুষের উন্নতি ৯৪
মানুষের নিজের চাওয়ার কারণে মসীবত ৯৫
টেনশন প্রতিদান বিনষ্ট করে ৯৫
ধৈর্যেও জান্নাত মিলে শোকরেও জান্নাত মিলে ৯৬
অধৈর্যে নিয়ামতের অবমূল্যায়ন হয় ৯৬
সবরের তৃতীয় স্তর ৯৭
যেদিকে মাওলা সেদিকেই শাহ দওলা রহ. ৯৭
সবরের (ধৈর্য) চতুর্থ স্তর ৯৭
অসুস্থ অবস্থায় আনন্দ ৯৮
আল্লাহর সেবা শুশ্রুষা ৯৮
ধৈর্যের পঞ্চম স্তর ৯৮
এক মহিলা সাহাবীর সীমাহীন ধৈর্য ৯৯
স্বামীকে খুশী করার জন্য মুচকি হাসবে ১০০
মহিলাদেরকে প্রতি কদমে কদমে ধৈর্যধারণ করতে হয় ১০০
মাতা-পিতার ঘরে ধৈর্য ১০১

বিবাহের পর ধৈর্য	১০১
মা হিসেবে ধৈর্য	১০২

ষষ্ঠ শর্ত

খুশূ তথা-বিনয়	১০৩
মাগফিরাতে ষষ্ঠ শর্ত	১০৩
খুশু এর মাকসাদ	১০৩
ভয় বিনয় সৃষ্টি করে	১০৪
হতাশা ও ভয়ের মাঝে পার্থক্য	১০৪
আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ	১০৫
ডাবল প্রতিদান	১০৫
ভয় একটি স্বভাবজাত বিষয়	১০৫
'খশয়াত' কাকে বলে?	১০৮
নবী কারীম সা.-এর ভয়ের স্তর	১০৯
নামাযে খুশু খুযু	১০৯
খুশু এর সম্পর্ক পূর্ণ শরীরের সাথে	১১২
মস্তিষ্কের (خشوع) একাগ্রতা	১১২
চোখের خشوع বা বিনয়	১১৩
দৃষ্টি সরানোর হুকুম	১১৩
দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আদেশ	১১৪
কানের خشوع (বিনয়)	১১৪
মোবাইলের রিংটোন	১১৪
মসজিদেও মিউজিক	১১৫
কিয়ামতের নিকটবর্তী নির্দশন	১১৬
যবানের খুশু خشوع (বা বিনয়)	১১৬
মুখ থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরণ	১১৮

অন্তরের খুশু বা বিনয় ১১৮
পেটের খুশু বা বিনয় ১১৯
লজ্জাস্থানের খুশু বিনয় ১২০
এক বদকার মহিলার বাস্তব ও পাক্কা তওবা ১২০
হাত ও পায়ের খুশু বিনয় ১২৫

সপ্তম শর্ত

দান-সদকা ১২৬
মাগফিরাতের সপ্তম শর্ত ১২৬
সম্পদ সদকা করা ১২৬
সদকায়ে জারিয়া ১২৮
সদকা শুধু ধন সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ১২৭
দেহের প্রতিটি জোড়ার সদকা ১২৮
মুচকি হাসি দেওয়াও সদকার অন্তর্ভুক্ত ১২৯
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা একটি সদকা ১২৯
আল্লাহর যিকির একটি সদকা ১৩০
সৎকাজের আদেশ একটি সদকা ১৩০
স্বামী- স্ত্রীর পরস্পর মিলনও একটি সদকা ১৩১
এই সমস্ত সদকা আখেরাতে কি কাজে আসবে? ১৩১
নেকি কাজে আসবে ১৩২

অষ্টম শর্ত

রোযা ১৩৬
মাগফিরাতের অষ্টম শর্ত ১৩৬
আত্মশুদ্ধি ১৩৬
রোযা সকল ধর্মের ইবাদত ছিল ১৩৭
রোযার তিনটি স্তর ১৩৯
রোজার উপকারিতা ১৪০

মস্তিষ্ক সচল ও তরতাজা থাকে ১৪০
গরীব-দুঃখীদের সাথে সহানুভূতীর জযবা সৃষ্টি হয় ১৪৪
রোযা এবং ইচ্ছাশক্তি ১৪৫
রোযা এবং দৈহিক সুস্থতা ১৪৬
পেটুকের কথায় কোন ধরনের প্রভাব থাকে না ১৪৯
সুস্থতার রহস্য ১৪৯
রোযার আত্মিক ফায়দা ১৫০
দুটি গুণ ১৫০
হযরত ফাতেমা রা. এর ধৈর্য ১৫৪
হযরত আসিয়া রা. এর ধৈর্য ১৫৬
আল্লাহ্ তায়ালা বিনিময়দাতা ১৫৮

নবম শর্ত

চারিত্রিক পবিত্রতার বিবরণ ১৬০
মাগফিরাতের নবম শর্ত ১৬০
লজ্জা নারীদের স্বভাবগত বিষয় ১৬১
নারীর জিহাদ ১৬২
ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার গুরুত্ব ১৬২
কুদৃষ্টি যিনা পর্যন্ত পৌঁছায় দেওয়ার একটি মাধ্যম ১৬৪
কুদৃষ্টি দ্বারা পেট ভরে না ১৬৫
কু-দৃষ্টির ক্ষতি ১৬৫
আল্লাহ্ তায়ালার গায়রাত ১৬৬
কু-দৃষ্টির উপর আল্লাহ্ তায়ালার লানত ১৬৭
কু-দৃষ্টি নাপাকী ১৬৭
কু-দৃষ্টি থেকে উত্তরণের উপায় ১৬৮
মহিলা স্বীয় পর্দার খেয়াল রাখবে ১৬৯
মোবাইলের মহামারী ১৬৯
মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৭০

আধুনিক কালের মহামারী ১৭১
যৌথ অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা চাই ১৭১
গান-বাদ্য যিনার দিকে উৎসাহিত করে ১৭২
বেগানা পুরুষ থেকে দূরে থাকা উচিত ১৭৩
পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখা ১৭৪
যৌন চাহিদার স্বভাবগত চিকিৎসা ১৭৫
হযরত আতা উল্লাহ শাহ বুখারী রহ. এর ফরমান ১৭৬
গোনাহ করবে একজন কিন্তু বর্তাবে অনেকের উপর ১৭৬
মেয়েদেরকে ভালো কাজে লাগিয়ে রাখবে ১৭৭
অবসর থাকবে না ১৭৮
একাকি থাকবে না ১৭৮
ইস্তিগফার এবং জিকির বেশী বেশী করা উচিত ১৭৮
যিনা ঋণ স্বরূপ ১৭৯
পুরুষ-মহিলার জিহাদ ১৮০
এক যুবতী নারীর জিহাদের জযবা ১৮২
গোনাহ থেকে যে বেঁচে যাবে তার ঠিকানা হবে জান্নাতে ১৮৩

মাগফিরাতের দশম শর্ত

আল্লাহর যিকির ১৮৬
অন্তর আল্লাহর যিকিরের স্থান ১৮৭
যিকরী কলবীর দৃষ্টান্ত ১৮৮
আল্লাহ বান্দাকে স্মরণ করেন ১৮৯
আম্বিয়া আ. কে যিকিরের নির্দেশ ১৯০
আল্লাহর স্মরণে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ১৯০
যিকির শয়তানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ১৯১
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ১৯২

বুদ্ধিমান লোক ১৯২
অসংখ্য সওয়াবের যিকির ১৯৩
ইস্তেগফার ১৯৩
শোকরের অসংখ্য ক্ষেত্র ১৯৬
জান্নাতীদের কালিমা ১৯৮
ধৈর্যের ক্ষেত্রসমূহ ১৯৯
ধৈর্যশীল বান্দা আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে ১৯৯
ধৈর্যশীলদের জন্য ফেরেশতার সহযোগিতা ২০০
চুপ থাকাই উত্তম জওয়াব ২০১
ঐ বছরের গোনাহ মাফ ২০২
জুমার দিনে বেশী বেশী দুরুদ পাঠ করা ২০৩

সকাল-সন্ধ্যা একশত বার

দুরূদ পড়ার ফযীলত ২০৪
হাজার বার দুরূদের ফযীলত ২০৪
হিসাব ছাড়া সওয়াব ২০৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন শরীফে ইরশাদ ফরমান -

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

কোরআনের এই একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ নিশ্চয়ই মুসলিম নর-নারী, وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ঈমানদার নর-নারী, وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ আনুগত্যশীল নর-নারী, وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ

সত্যবাদী পুরুষ-নারী وَالصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ ধৈর্যশীল নর-নারী, وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ বিনয়ী নর-নারী وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ সদকাকারী পুরুষ-নারী وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ রোযাদার পুরুষ-নারী وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ-নারী وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ-নারী أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجْرًا عَظِيْمًا আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা-প্রতিদান।

আয়াতের শানে নুযুল

এই আয়াতের শানে নুযুল হল আনসারী মহিলা উম্মে আম্মারা রাযি. নবী কারীম সাঃ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! কোরআনের অধিকাংশ স্থানে পুরুষদের পু. লি. শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং তাদের মধ্যস্থতায় আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তবে হৃদয়ের কামনা ছিল, যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ করবেন যাতে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদের ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্বোধনের সৌভাগ্য হাসিল হয়ে যাবে। এই প্রশ্ন আল্লাহর উপর তাদের মহব্বতের ভিত্তিতেই করা হয়েছে, যদিও তারা বুঝতেন যে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পুরুষদের শব্দ পু. লি. ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু মহিলারাও তাতে শামিল। তবে তারা প্রশ্ন করে মহব্বতের বহি:প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেন। সুতরাং তাদের আকাংখার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এটি এমন একটি সারগর্ভ আয়াত যাতে পুরুষ মহিলা উভয়ের আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পুরুষকে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন, মহিলাকে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের মাগফিরাতের জন দশটি শর্ত বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের মাকসাদ

আজ কোরআন মাজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্যে হল, রমযানের বাকী দিনগুলোতে যেসকল বয়ান হবে, সবগুলো বয়ান এই আয়াতের অধীনে হবে, এবং আয়াতের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে হবে। আসল উদ্দেশ্য হল আমরা কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ক্ষমা পেতে পারি। এবং তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারি। সুতরাং যেহেতু এটি এমন একটি আয়াত যার উপর আমল করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে অতএব এখন কাজ সহজ হয়ে গেছে। মহিলাদের নিকট আবেদন তারা এই আয়াতের অনুবাদ স্মরণ রাখার চেষ্টা করবে, এবং তার যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে, তা আমলের নিয়তে শুনবে, এই উপদেশগুলোকে আমলের পোশাকে আবৃত করবে, যাতে করে আমরা এই আয়াতের উপর আমল করতে পারি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার পুরস্কারে ভূষিত হতে পারি। এই কারণে এই আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দ খুলে খুলে ব্যাখ্যা করা অতি প্রয়োজন। যে সেকল মহিলারা এই আয়াতটি মুখস্থ করে নিবে, তাদের জন্য খুব ভালো বিষয় হবে।

ক্ষমার প্রথম শর্ত

আজ শুধু প্রথম শর্ত নিয়ে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ নিশ্চয় প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-নারী অর্থাৎ ক্ষমার জন্য প্রথম শর্ত হল অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। মুসলিম হল সে যে, কালিমা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

জীবন যাপনে ইসলাম ধর্মপ্রাণ তুল্য

এই ধর্ম আমাদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রাণ তুল্য, তার ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করুন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যেমন চক্ষু দেখে, যবান কথা বলে, কান শ্রবণ করে, হাত গ্রহণ করে, পা চলে, প্রত্যেকটি অঙ্গের নির্দিষ্ট একটি Funston (কাজ) আছে। এক অঙ্গের কাজ অন্য অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এক অঙ্গ যে কাজ

সম্পাদন করে অন্য অঙ্গ সেই কাজ করতে পারে না। যেমন আমরা চোখ দ্বারা দেখি কিন্তু শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা দেখা যায় না। যবান দ্বারা আমরা কথা বলি কিন্তু শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা কথা বলা যায় না। কান দ্বারা আমরা শ্রবণ করি, কিন্তু শরীরে অন্য কোন অঙ্গ শুনতে পারে না। যেন মানুষকে বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। একটির গুণ অন্যটি থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, যে, একটি অপরটির বিপরীত বস্তু। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই বিপরীতমুখী অঙ্গসমূহের সমুষ্টির মাঝে রূহ দিয়েছেন, যে কারণে সবগুলো অঙ্গ এক হয়ে কাজ আঞ্জাম দেয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে আত্মা বিদ্যমান থাকে, পা আঘাত প্রাপ্ত হলে চোখ অশ্রু বর্ষণ করে, পায়ে ব্যথা হলে চোখে ঘুম আসে না, চোখ একথা বলে না পায়ে ব্যথা হয়েছে আমার তো ব্যথা নেই, ক্লান্ত অবস্থায় আমার ঘুমানো উচিত। যেহেতু আত্মা বিদ্যমান সেহেতু এক অঙ্গের স্বাদ পুরো অঙ্গের স্বাদ, এক অঙ্গের কষ্ট পুরো শরীরে কষ্টের কারণ হয়ে যায়। যেন সমস্ত অঙ্গ এক হয়ে কাজ করে। এগুলোর মাঝে একতা পাওয়া গেছে। এমন কখনোই হয় না, যে মাথা ব্যথা হল পা ডাক্তারের কাছে যেতে অস্বীকার করেছে, এটি আমার বিষয় নয়, এটি মাথার বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে আত্মা বিদ্যমান থাকে শরীরের সকল অঙ্গ এক হয়ে কাজ করে। এগুলোর মাঝে Unity (একতা) পাওয়া যায়। হ্যাঁ শরীর থেকে যখন আত্মা বের হয়ে যায় তখন কেউ মৃত ব্যক্তির বাহু কর্তন করতে চাইলে পা শরীরকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হয় না। চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে না। কেননা এখন শরীরে আত্মা নেই। (একতা) নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই উদাহরণ বুঝে আসলে এখন আমাদেরকে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমাদের পরিবার এমন লোকদের সমষ্টি, যারা একে অপর থেকে ভিন্ন। একজনের অবস্থা অপরজনের অবস্থা থেকে ভিন্ন। যেমন স্বামী-স্ত্রী, কন্যা, ভাই-বোন, মিলে ঘর চলে। স্বামীর যে অবস্থান তা অন্য কারো হতে পারে না। ভায়ের অবস্থান বোন গ্রহণ করতে পারে না। বোনের অবস্থান ভাই গ্রহণ করতে পারে না। সকলেই একে অপর থেকে ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে একটি বস্তু দান করেছেন, যাকে আমরা (دين) ধর্ম বলি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মাঝে এই দ্বীন বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মহব্বতের সাথে জীবন যাপন করে, যেমন আত্মা থাকা কালে শরীরের অঙ্গসমূহ এক হয়ে কাজ করে। সুতরাং যে ঘরে দ্বীন বিদ্যমান থাকে সেখানে সন্তানের উপর পিতার মাতার স্নেহ থাকে।

সন্তানদের অন্তরে পিতা মাতার সম্মান বিদ্যমান থাকে। বোন ভাইকে মহব্বত করে, ভাই বোনের সাথে কোমল আচরণ করে। ঘরের সকল সদস্য এক শরীরের মত হয়ে যায়। ঘরের একজন পেরেশান হলে সকলে পেরেশান হয়ে যায়। একজনের খুশি পুরো ঘরের খুশির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা সকলে একটি জীবিত শরীরের মত।

আর যদি ঘর থেকে দ্বীন বের করে দেয়া হয় তাহলে এই পরিবার একটি মৃত শরীরের মত। একজনের সাথে অপরজনের সম্পর্ক থাকে না। আমরা দেখে থাকি যে ঘরে দ্বীনদারির জিন্দেগী নাই, স্বামী স্ত্রীর পরোয়া করে না, স্ত্রী স্বামীকে পরোয়া করে না, বোন ভাইয়ের সাথে কথা বলে না, ভাই বোনকে দেখতে পারে না, ঘরের সকল লোক একে অপর থেকে পৃথক থাকে, এমন কি কেউ কেউ আমাদের নিকট অভিযোগ করে, পিতা অভিযোগ করে সন্তান প্রতিপালন করে বড় করেছি, যুবক বানিয়েছি, এখন এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে ছয় মাস হয়ে গেছে, আমার সাথে খাবার খাওয়ার সুযোগ তার হয় না। মা অভিযোগ করে বিবাহের পর সন্তান এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, চার মাস হয়ে গেল এখন পর্যন্ত আমাকে দেখল না।

সুতরাং দ্বীন যখন জীবনের অঙ্গন থেকে বের হয়ে যায়, তখন ঘরের প্রত্যেকটি সদস্য একে অপরের জন্য অপরিচিত হয়ে যায়। অন্যের সাথে ভালোবাসা খতম হয়ে যায়। সহমর্মিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পরে।

আর যদি ঘরে দ্বীন বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেটি একটি আদর্শ পরিবারে রুপান্তরিত হয়, পরস্পর সহমর্মিতা ও ভালোবাসা থাকে। একটি উদাহরণ বুঝুন, যদি কোন মানুষের শরীর থেকে আত্মা বের করে দেয়া হয়, তারপর

অক্সিজেন দিয়ে তার ভেতরে বাতাস ঢুকানো হয়, তবে কি সে জীবিত হবে? কখনই সে জীবিত হতে পারে না। বাতাস আত্মার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অনুরুপভাবে যদি ঘর থেকে দ্বীন বের করে দেওয়া হয় এবং মানবরচিত বিধিমালা এই ঘরে আরোপ করা হয় তবে কি পরস্পর মহব্বত সৃষ্টি হবে? কখনই হতে পারে না। এজন্য যে ঘরে দ্বীনদারী নেই সেই ঘরে উপরে উপরে পরস্পর মহব্বত থাকে কিন্তু অন্তরে অন্তরে একে অপরকে ঘৃণা করে।

অন্তরসমূহ জোড়া লাগানোর গাম

এই বিষয়টি অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে দুটি জিনিসকে জোড়া লাগানোর জন্য তৃতীয় একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরুপ কাগজের দুটি টুকরা জোড়া লাগানোর জন্য গাম ব্যবহৃত হয়। গাম ব্যবহারের ফলে কাগজের দুটি টুকরা এক হয়ে যায়। যদি কাপড়ের দুটি টুকরাকে জোড়া লাগানো হয়, গাম কাজে আসে না, সুঁই সুতা ব্যবহার করতে হয়, তাহলেই কাপড়ের দুই টুকরা এক হয়ে যায়। দুটি কাঠের টুকরা মিলানোর জন্য সুঁই সুতা কাজে আসে না, পেরেক ব্যবহার করতে হয়, তাহলেই কাঠের দুই টুকরা এক হয়ে যায়। দুটি ইট জোড়া দেয়ার ক্ষেত্রে পেরেক কোন কাজে আসে না, বরং সিমেন্ট ব্যবহার করতে হয়। তবেই দুইটা ইট মিলে যায়।

প্রত্যেক দুটি বস্তুকে মিলানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এখন চিন্তা করা উচিত, দুইজন মানুষকে মিলানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় সেই কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর হলো 'দ্বীন ইসলাম' যদি দুইজন বান্দা এক ও নেক হয়ে যায় এবং মুত্তাকী বনে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। কোরআন শরীফে এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এসেছে-

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

(যারা মুমিন ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।)

সুতরাং দ্বীনে ইসলাম দ্বারা মানুষের অন্তরসমূহে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এই কারণে আমাদের জীবনে দ্বীন ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এমন যেমন শরীরের জন্য আত্মা। আত্মা ছাড়া যেমন শরীরের কল্পনা করা যায় না, তেমন দ্বীন ছাড়াও সফল জীবনের কল্পনা করা যায় না।

গতানুগতিক মুসলমান বনাম স্বেচ্ছায় ও পাক্কা মুসলিম

আমরা যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি তা এই কারণে নয় যে, এটি আমাদের বাপ দাদাদের ধর্ম; বরং আমরা এই কারণে মুসলিম হয়েছি যে, ইহা একটি বড় নিয়ামত যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে এই উম্মতকে দান করেছেন। আমাদের পিতা মাতার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর আমরা তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করে নিয়েছি। আমরা Muslim by chance (গতানুগতিক) মুসলমান নই, বরং আমরা Muslim by choice (পাক্কা ও স্বেচ্ছায়) মুসলমান। আমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতএব যেহেতু আমরা চিন্তা ভাবনা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছি এবং জীবনের dicision সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা তৈরী হয়েছে, তাই আমাদের সিদ্ধান্ত হল আমরা কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলাম এবং আমরা ইসলাম ধর্মকে আমাদের জীবনে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী মনে করি।

মাথার চুল থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত আমরা মুসলমান

আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম ধর্মকে পছন্দ করেছেন وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة٤ :) (আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনিত করলাম) আমাদের কাছে আল্লাহর চাওয়া يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (البقرة : ٠) (হে ঈমানদারগণ, ইসলাম ধর্মে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর) অর্থাৎ মাথার চুল থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত মুসলমান হয়ে যাও। সুতরাং আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে নিতে হবে। যদি শুধু যবান দ্বারা মুসলমান পরিচয় দেওয়া হয় আমল না করা হয় তাহলে ইহা অসম্পূর্ণ বিষয় থেকে যাবে।

এক কবি বলেন-

خرد نے کہ دیا لاالہ تو کیا حاصل * دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

কবিতার অর্থ : পাথরও বলে দিল 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাহলে তার কি হাসিল হল? অন্তর মুসলমান না হলে কিছুই অর্জন হবে না।

কোন এক কবি বলেন,

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لاالہ الا * لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دی گواہی

তুমি আরব হও কিংবা অনারবী হও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অন্তর 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষী না দিবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' তোমার কাছে অপরিচিত শব্দের মত। আমাদের বুঝতে হবে, যেহেতু আমরা মুসলমান সেহেতু আমাদের উপর বড় যিম্মাদারী এসে পড়েছে।

چوں می گویم مسلمانم بلرزم * کہ دانم مشکلات لاالہ را

আমি মুসলমান হওয়ার কারণে আমার স্পন্দন সৃষ্টি হয় এই কারণে যে আমি লা-ইলাহার দুঃখ-কষ্ট জানি।

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট

ইসলাম ধর্মের এমন সকল বৈশিষ্ট রয়েছে, যা আমাদের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। আমাদের ইলম সীমীত, উলামায়ে কেরামের নিকট এর বিস্তারিত ইলম বিদ্যমান। তারপর ও এই অক্ষম আপনাদের সম্মুখে কিছু বৈশিষ্ট পেশ করছে, যাতে অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমুল হয়ে যায় যে বাস্তবেই ইসলাম ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

পবিত্রতার ধর্ম

ইসলামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব : সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম মানুষকে পবিত্রতা শিক্ষা দেয়। পুতঃপবিত্র জীবনের দিশা প্রদান করে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদের পছন্দ করেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান–اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ। (পবিত্রতা ঈমানের অংশ)

ইসলাম ধর্মে পবিত্রতার যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্য কোন ধর্মে সে পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। লক্ষ্য করুন, প্রয়োজন (টয়লেট) করার পর পবিত্রতার নির্দেশ প্রদান করেছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রথমে মাটি তারপর পানি ব্যবহার করে নাপাকী দূর করতেন। বর্তমানে মাটির পরিবর্তে টিস্যু ব্যবহার করা হয়। শুধু ইসলাম ধর্মেই এক সাথে দুটি বস্তু ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছে। আপনি ইউরোপ গিয়ে দেখবেন সেখানে পানির ব্যবহার নেই। শুধু টয়লেট পেপারের মাধ্যমে নাপাকী দূর করা হয়। অথচ সবাই বুঝতে সক্ষম যে, এর দ্বারা নাপাকী দূর হয় না। অধিকাংশ স্থানে তো পানির সংযোগই থাকে না। পক্ষান্তরে ইসলাম এমন পবিত্রতা ও শারীরিক সুস্থ্যতার অনুভুতি সৃষ্টি করেছে যে প্রথমে মাটি বা টয়লেট পেপার তারপর পানি ব্যবহার কর, সুতরাং একজন মুসলমান যে পরিমাণ পবিত্রতার জীবন যাপন করে অন্য কেউ সেরুপ করে না।

নামাযের জন্য অযু আবশ্যক

গভীরভাবে চিন্তা করুন, ইসলাম মানুষেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তার পূর্বে পাঁচবার অযুর নির্দেশ প্রদান করেছে। এমন কোন ধর্ম আছে যার অনুসারীদেরকে দিনে পাঁচবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করেছে? বর্তমানে ইহুদিরা সপ্তাহে মাত্র একদিন, খৃষ্টানরা শুধু রবিবারে উপাসনা করে। আর বাকী দিনগুলোতে মনছাহী জীবন যাপন করে। ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যের উপর নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত, যে প্রত্যেক বান্দাকে, দিনে পাঁচবার নামায এবং নামাযের পুর্বে অযুর নির্দেশ প্রদান করেছে।

লক্ষ্য করুন, অযুতে ঐ সকল অঙ্গসমূহের ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করেছে, যেগুলো সাধারণত কাজকর্মের সময় বস্ত্রহীন থাকে, যেমন চেহারা খোলা থাকে, হাত খোলা থাকে, পা খোলা থাকে, যে সকল অঙ্গ খোলা থাকে সে সকল অঙ্গ ধৌত করার আদেশ করা হয়েছে যাতে ধুলাবালি ও ময়লা সম্পুর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

গোসলের নির্দেশ

ইসলাম নারী পুরুষকে মিলনের পর গোসলের নির্দেশ প্রদান করেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই বিষয়টি অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমান মেডিকেল ডাক্তারও একথা বলেছে যে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর গোসল করার দ্বারা শরীরের লোমকোষ থেকে নির্গত ঘামের কারণে শরীর যে ময়লাযুক্ত হয় তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

লক্ষ্য করুন : সাধারণভাবে মানুষ দিনে একবার বা সকাল বিকাল দুইবার মেসওয়াক কিংবা ব্রাশ করে থাকে। কিন্তু অযুতে দৈনিক পাঁচবার মেসওয়াক করা সুন্নত। দেখুন মুমিন বান্দা পাঁচবার মুখ পরিষ্কার করে, তারপর নাক পরিষ্কার করে, কান আঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করে, পায়ের আঙ্গুলসমূহ মালিশ করে। জুমার সময়ে গোসল করে যাওয়াকে সুন্নত সাব্যস্থ করা হয়েছে। স্পষ্ট হয়ে গেল, ইসলাম ধর্ম পবিত্রতার এমন শিক্ষা দিয়েছে, যে পবিত্রতা অন্য কোন অমুসলমান হাসিল করতে পারে না।

পরিপাটি হয়ে মসজিদের যাওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف:)

হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করে ও পরিপাটি হয়ে আসো। মুমিন মসজিদে সুন্দর ও পরিপাটি হয়ে আসে, মহিলারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়াবে, কারণ ঘরই তাদের মসজিদ। দেখুন বহু মানুষ কাজকর্ম করে, শরীরে ময়লা আবর্জনা লেগে থাকে। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে পাঁচবার পরিষ্কার হয়ে মসজিদে আসার হুকুম দিয়েছে। এই পুতঃপবিত্র জীবন একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট।

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

লক্ষ্য করুন, মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলে ঘরোয়া জীবনের (পরিকল্পনা) ইসলাম ধর্ম প্রদান করেছে।

সন্তানের সাথে পিতা মাতার সম্পর্ক

সন্তানের প্রতি স্নেহ

শরীয়ত পিতা-মাতাকে আদেশ দিয়েছে সন্তানের উত্তম প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও ব্যয়ভার গ্রহণের। সন্তান কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়ালেখা করে, পিতা-মাতা এর খরচের ভার গ্রহণ করে। এই বিষয়টি আপনি অমুসলিম দেশে দেখতে পাবেন না। ষোল বছর বয়স হয়ে গেলে নিজের পাথেয় নিজেকেই গ্রহণ করে, অন্যের কাছ থেকে কর্য নেয়। আমরা দেখেছি সেখানে ছাত্ররা পনেরো বছর পর্যন্ত ভার্সিটির ঋণই পরিশোধ করে। মা-বাবা এর যিম্মাদারী নেয় না, কিন্তু দ্বীনি পরিবেশে লক্ষ্য করুন, মা-বাবা সকল খরচ বহন করে থাকে।

মা-বাবার সম্মান

লক্ষ্য করুন মা-বাবাকে ইসলাম এমন সম্মান দিয়েছে যা অমুসলিম দেশসমূহে লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে সন্তানের ১৮ বছর হয়ে গেলে, মা-বাবার কোন অধিকার সন্তানের উপর থাকে না। শুধু বছরে একদিন ফাদারকে মাদারকে (মা দিবস, বাবা দিবস) বানিয়ে নিয়েছে। এই দিবসে শুধু ফোন করে বা চিঠি লিখে মা-বাবার হক আদায় করে দেওয়া হয়। একবার আমেরিকার সফরে এক বৃদ্ধা মহিলা আমাদের কাছে এসে প্রশ্ন করল আপনারা কি মুসলমান? আমরা বললাম হ্যাঁ। মহিলা বলল, আমি শুনেছি আপনারা মুসলমানেরা ওয়াদা ভংগ করেন না, আমরা বললাম, হ্যাঁ বাস্তবেই আপনি সত্য বলেছেন। সে বলল, আপনি আমার সাথে একটি ওয়াদা করুন।

আমি বললাম, কি ওয়াদা করব? সে বলল, আমি বৃদ্ধা মহিলা, আমার ছেলে আছে মেয়েও আছে। কিন্তু তারা যুবক হওয়ার পর এক মিনিট সময় দেওয়ার সুযোগও তাদের হয় না। আমি ঘরে একা থাকি। একাকিত্বের কারণে আমার মাঝে সংকীর্ণতা চলে এসেছে। মনে হচ্ছে মানুষিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ব। সারাদিন ঘরে থাকি কেউ আমাকে ফোন করার মত

নেই। খায় কি খায় না, ঘুমায় কি ঘুমায় না বাচি না মরি কেউ আমার খবর নেওয়ার মত নেই। কারো সাথে আমার অন্তরের সম্পর্ক নেই। বাকী জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আপনি একটি কাজ করবেন, সেটি হল দিনে একবার ফোন দিয়ে শুধু এতটুকু জিজ্ঞাসা করবেন যে, আপনি ভাল আছেন এবং ভালো থাকুন। টেলিফোন বিল আমি পরিশোধ করে দিব। এর ফায়দা এই হবে যে, আমি সারাদিন অপেক্ষায় থাকব যে একজন আমাকে ফোন দিবে।

এই ঘটনা থেকে আমার বুঝে আসল, যে যারা ইসলাম ছেড়ে জীবন-যাপন করে তারা কতই না মসীবতে আক্রান্ত। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, সন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন বৃদ্ধ মুসলমানকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান করল সে যেন আপন পরওয়ারদিগারের হুকুমের সম্মান করল। সুতরাং ইসলাম সকল বৃদ্ধ নর-নারীর সম্মানের আদেশ প্রদান করেছে। কিন্তু অমুসলিম দেশসমূহের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা

এক মহিলা যুবক ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করল যে, যুবক পুত্র আমার সাথে এ বিল্ডিংয়ে থাকে, সে একটি কুকুর পালে। কুকুরটাকে গোসল করায়, খাওয়ায়, কুকুরের সাথে খেলা করে, কিন্তু আমার কামরায় এক মিনিটের জন্যও আসে না। ছেলে উকিল ধরল। মাও উকিল ধরল। পরিশেষে ভ্রাম্যমান আদালত এই ফয়সালা দিল যে, যেহেতু সে কুকুর নিজেই প্রতিপালন করে, তাই তা তার liabilit (যিম্মাদারী) মনে চাইলে এক ঘণ্টা সময় দিবে, মনে চাইলে পাঁচ ঘণ্টা সময় দিবে। এটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি সে তার মার কামরায় এক মিনিটের জন্যও না যায়। আদালত তাকে এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারবে না। কারণ তার বয়স আঠার পেরিয়েছে, এখন মার উপর তার কোন যিম্মাদারী নেই। এখন বলুন ঐ পরিবেশে মায়ের অবস্থা কি হবে যেখানে সন্তান মাকে নিজের চেহারা

দেখাতেও প্রস্তুত নয়। আমাদের এক অফিসার বর্ণনা করেন, আমি কোন এক অমুসলিম রাষ্ট্রের কারো অফিসে গেলাম। আমার সামনে তার কাছে হসপিটাল থেকে ফোন আসল যে, তার পিতা মারা গেছে। সে ডাক্তারকে বলল যে, তাকে Symetry service দাফন কর্মকর্তাদের কাছে দিয়ে দেন আমি এর বিল পরিশোধ করে দিব। সে বলল, আমি ঐ যুবককে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি গিয়ে তোমার বাবার চেহারা দেখবে না? দেখাতো উচিত। সে বলল, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। এখন বলুন যে পুত্র পিতার মৃত্যুর পর তার চেহারাও দেখতে পছন্দ করে না সে বাপ জীবদ্দশায় কি সুখে ছিল?

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক

ইসলাম পারিবারিক জীবনের যে পরিকল্পনা প্রদান করেছে তা অনৈসলামিক রাষ্ট্রে নযরে পড়ে না। শরীয়ত তো একথাও বলেছে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম। নবী কারীম সা. স্বামী-স্ত্রীকে এত পরিমাণ মহব্বতের শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, হাদীসে এসেছে যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসে এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসে, আল্লাহ্ ও তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা, হৃদ্যতা, সম্পৃতি, অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার যে শিক্ষা দিয়েছে তা বাহিরের দেশে দেখা যায় না।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে সেই ভালবাসা ও সম্পৃতির পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইরশাদ ফরমান, (النساء :) وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তোমরা তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে মহিলাদের জন্য সুপারিশ করছেন, আর স্বামীদেরকে মহব্বত কর, তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন কর। এই ঘরোয়া জীবনের পরিকল্পনা ইসলামেরই সুন্দর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। অনৈসলামিক দেশে স্বামী-স্ত্রী তো বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক আছে কিন্তু তাদের খরচ পৃথক পৃথক থাকে। আমরা একবার দেখছি, স্বামীর সিগারেটের প্রয়োজন পড়লে স্বামী স্ত্রীর কাছে থেকে ধার নিল। আর বলতে লাগল আমার স্ত্রীর সিগারেটের

প্রয়োজন দেখা দিলে সে আমার কাছ থেকে ধার নেয়, আমিও তার থেকে ধার নেই। অথচ তাদের উভয়ের বিবাহ হয়েছে বাইশ বছর হয়ে গেছে। এখন বলুন যারা একে অপর থেকে সিগারেট ধার নেয় তাদের মাঝে কেমন মহব্বত হতে পারে?

ইসলাম কল্যাণকামিতার ধর্ম

ইসলাম কল্যাণকামিতার ধর্ম। শরীয়ত অন্যের কল্যাণকামিতার নির্দেশ প্রদান করেছে। নবী করীম সা. ফরমান দ্বীন হল কল্যাণকামিতা মুমিন প্রত্যেকেরই কল্যাণকামী। আমরা যবান দ্বারা নিজেদেরকে মুসলমান বলি কিন্তু আমল করি না। এটি আলাদা বিষয়, ইহা আমাদের দুর্বলতা। অন্যথায় দ্বীনের শিক্ষা তো ভিন্ন। শরীয়ত বলে যে মানুষ নিজের কল্যাণকামী হবে এবং তার সাথীর ও কল্যাণকামী হবে। প্রত্যেকের কল্যাণকামী হবে। আমাদের আকাবিরদের জীবনে কল্যাণকামিতা এত অধিক পরিমাণে ছিল- আল্লাহু আকবার, আমরা তা পাঠ করে হয়রান হয়ে যাই। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন মানুষের মাঝে সবচাইতে উত্তম সেই ব্যক্তি যে মানুষকে উপকার করে।

অন্য হাদীসে এসেছে- إِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর আসমানওয়ালা তোমাদের উপর দয়া করবেন। ইসলাম শুধু মানুষের সাথেই নয় পশুর সাথে কল্যাণকামিতারও নির্দেশ প্রদান করেছে।

কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে প্রতিদান

হাদীসে এসেছে বনী ইসরাঈলের এক যিনাকারী মহিলা পিপাসার্ত একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যদি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে যিনাকারী মহিলাকে মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে একজন পিপাসার্ত মানুষকে পানি পান করালে কি পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে?

কোরআনে পিপিলিকার কল্যাণকামিতার আলোচনা

কোরআনের আয়াতে পিপীলিকার আলোচনা এসেছে। একবার হযরত সোলায়মান আ. সৈন্যসহ সিংহাসনে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলেন। একটি পিপীলিকা তা দেখে অন্য পিপীলিকাদেরকে বলল, يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর, যাতে করে হযরত সোলাইমান আ. এর বাহিনী তোমাদেরকে পিষে না ফেলে। সকল পিপীলিকা গর্তে প্রবেশ করল। পিপীলিকার এই কল্যাণকামিতা আল্লাহর কাছে এতই পছন্দ হল, যে কারণে কোরআনে এর আলোচনা করেছেন। একটি সূরার নাম রেখেছেন (পিপীলিকার নামে) যদি একটি পিপীলিকার কল্যাণকামিতা আল্লাহর কাছে এত পছন্দ হয়, তাহলে একজন মানুষের কল্যাণকামিতা অপরের জন্য আল্লাহর কাছে কতইনা পছন্দনীয় হবে। অতএব আমাদেরকে অন্যের কল্যাণকামী হতে হবে।

সবই কল্যাণকামিতা

শরীয়তের হুকুম হল, কারো সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করা ইবাদত। অন্যের কাজে সহযোগিতা করাও ইবাদত। কাউকে পথ দেখানো ইবাদত। যমীনে চারা রোপন করা ইবাদত। সদকা করা ইবাদত। যদি কেউ কোন ইয়াতীমের মাথায় স্নেহের পরশ বোলায়, তাহলে তার হাতের নীচের সমপরিমাণ চুলের নেক আমল তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। তাই ইয়াতীমের মাথায় স্নেহের পরশ বোলানো ও ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। কতই না কলাণকামিতা!

একটি মাছির কল্যাণকামিতার কারণে পুরস্কার লাভ

একজন মুহাদ্দিস দ্বীনের বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মৃত্যুর পর স্বপ্নে কেউ তকে প্রশ্ন করল হযরত! আপনার কি অবস্থা? উত্তর দিল, আমি তো ক্ষমা পেয়ে গেছি। স্বপ্নদ্রষ্টা বলল, ঠিক আছে আপনিতো ক্ষমা পাওয়ারই যোগ্য। কারণ আপনি হাদীসের বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, মানুষকে ইলম শিখিয়েছেন। দ্বীনের প্রচার প্রসার করেছেন। তিনি বললেন, না বরং

আমার ক্ষমা এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়েছে, যা আমার স্মরণেই নেই। প্রশ্নকারী বলল, সেই কাজটি কি? মুহাদ্দিস বলল, একবার হাদীস লেখার জন্য কলমে কালি নিলাম। ইত্যবসরে একটি মাছি এসে কালি উপর বসল। আমি চিন্তা করলাম মাছিটি পিপাসার্ত, সে কালি খেয়ে নিক। আমি কিছুক্ষণ কলম চালনা বন্ধ রাখলাম। যাতে সে পিপাসা নিবারণ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য একটি মাছির পিপাসা নিবারণ করেছ, আমিও তোমাকে জাহান্নামের পিপাসা থেকে থেকে মুক্তি দিলাম। এই অপূর্ব দরদও কল্যাণকামী জীবন যাপনে ইসলামই আমাদের প্রদান করেছে যে, তোমরা শুধু মুসলমানই নয় অমুসলিমদের প্রতিও কল্যাণকামী হও।

সকলের প্রতি কল্যাণকামিতা

আমাদের আকাবিরদের মধ্যে মিঞা আসগর হুসাইন রহ. বড় বুযুর্গ ছিলেন। একবার তিনি তার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সাথে অন্য লোকও ছিল। পথিমধ্যে একটি ঘরের নিকটবর্তী হলে পায়ের জুতা খুলে নিলেন। সে ঘরটি অতিক্রম করার পর পুনরায় জুতা পরিধান করেন। কোন এক সাথী এর কারণ জানতে চেয়ে বলল, হযরত! আপনি এমন করলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, ঘরটি একজন অমুসলিম নর্তকীর ঘর। সে তার যৌবনকালে এই কাজে লেগে গেছে, প্রত্যেকদিন পরিপাটি হয়ে থাকত, আর লোকেরা অপকর্মের জন্য তার ঘরে আসত। যখন সে বয়স্কা হয়ে গেল, লোকদের আনাগোনাও কমে গেল। যখনই আমি এই রাস্তা অতিক্রম করি, পায়ের জুতা খুলে ফেলি, যাতে পুরুষের জুতার আওয়াজ শুনে সে এই ধারণা না করে যে, আমার কাষ্টমার এসেছে। এখন চিন্তা করুন তারা মানুষের কত কল্যাণকামী ছিলেন যে একজন বদকার মহিলাকেও কষ্ট দিতে চান নি। তাহলে নেককারদের অন্তর কত খুশিতে রাখা উচিত।

ইসলাম আমাদেরকে এই কল্যাণকামিতা শিক্ষা দিয়েছে। নবী করীম সা. ইরশাদ ফরমান, যার হৃদয়ে মুমিন ভায়ের প্রতি সহমর্মিতা নেই সে আমার উম্মত নয়। এক সাহাবী আল্লাহর রাসূল সা. কে প্রশ্ন করলেন أَيُّ النَّاسِ

أَحَبُّ إِلَى الله আল্লাহর কাছে সবার চেয়ে প্রিয় মানুষ কে? নবী করীম সা. বললেন, যে মানুষের বেশী উপকার করে, আল্লাহর কাছে সে সবার চেয়ে অধিক প্রিয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরুপ কল্যাণকামিতার জীবন দান করুন। আমীন

ইসলাম ও সেবার অনুপ্রেরণা

ইসলাম আমাদেরকে অন্যের সেবা করার আদেশ প্রদান করেছে। সন্তান পিতা-মাতার সেবা করবে। ছোট বড়কে সেবা করবে। ছাত্র উস্তাদের, মেযবান মেহমানের সেবা করবে। সেবা এমন একটি শিরোনাম যার কোন সীমা নেই। শুধু মুসলমানকেই নয়, মানুষ হওয়ার সুবাদে সকলের খেদমত করতে হবে।

আকাবিরদের ঘটনাবলী

আমাদের আকাবিররা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

(ক) একজন আলেম হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন, সাথে এক হিন্দুও তার সাথি হল। আলেম ঘাবড়ে গেল যে হিন্দু আমার সাথে এসেছে, শায়খুল হিন্দ তাকে পছন্দ করবেন কি করবেন না আমারতো জানা নেই। আসার পর হযরত তাদের উভয়কে খাবার খাওয়ানোর পর শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আলেম বর্ণনা করেন, রাতে চোখ খুললে আমি আশ্চর্য বিষয় দেখতে পেলাম যে শায়খুল হিন্দ রহ. এর মত বুযুর্গ হিন্দু ব্যক্তির পা দাবিয়ে দিচ্ছেন।

(খ) হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. একবার ট্রেনে সফর করছিলেন। এক হিন্দু টয়লেট করতে গিয়ে টয়লেট ময়লাযুক্ত হওয়ায় ফিরে আসল। এত অপরিস্কার যে কেউ প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। সে এসে ভীষণ অভিযোগ করতে লাগল যে, মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখে না। গান্দেগী ফেলে রাখে। কেউ টয়লেট ব্যবহার করতে পারে না। তার কথা শুনে শায়খুল হিন্দ উঠে গিয়ে টয়লেট পরিস্কার করে চলে আসলেন। ঐ লোককে বললেন, আমি এইমাত্র টয়লেট ব্যবহার করেছি

সম্পূর্ণ পরিস্কার। হিন্দু লোকটি টয়লেট ব্যবহার করে এসে বলতে লাগল, আমি আপনার বিরোধী ছিলাম। আপনার এই কাজ আমাকে আপনার আশেক বানিয়ে দিয়েছে। তাঁরা তো সে সকল লোক যারা বাস্তবেই আল্লাহকে খুশি করে নিয়েছেন।

(গ) হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ. লিখেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এক বৃদ্ধা মহিলার দু'আর বরকতে মুফতীয়ে আযম বানিয়েছেন। একবার আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। এক বৃদ্ধা কুপ থেকে পানি উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার মনস্থ করল। কলসি তার মাথায় তুলে দেওয়ার জন্য সে কারো অপেক্ষায় ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে বৃদ্ধা খুব দুর্বল, কলসিও ভারী। সে কিভাবে এটা উঠাবে। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি রাস্তা দেখিয়ে দেন। আমি ঘরে পৌছে দেই। অতএব আমি কলসি মাথায় নিয়ে ঘরে পৌছে দিলে বৃদ্ধা আমার জন্য এত পরিমাণ দু'আ করলেন যার ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই পরিমাণ ইলম দিয়েছেন।

চিন্তা করে দেখুন

বলুন তো আমরা কি বর্তমানে মানুষের কাজ করে দেই। যুবতী মেয়েরা চিন্তা করে দেখুক। তার মার খেদমত করে না, যুবক ছেলেরা বাবার খেদমত করে না। আজ মা মেয়েকে বলতে পারে না, যে এক গ্লাস পানি নিয়ে আস। ইহা এই কারণে যে ইসলামী শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রবেশ করেনি। আমাদের তারবীয়াত গ্রহণ করা (শিক্ষা-দীক্ষা) প্রয়োজন। ইসলামে পিতা-মাতার হক সবার উপরে। তারপর বিবির হক, তারপর ভাই-বোনের হক। তারপর প্রতিবেশীর হক, তারপর আত্মীয়-স্বজনদের হক, তারপর সাধারণ মুসলমানদের হক। বরং অমুসলমানদেরও হক রয়েছে। তারপর পশুরও হক আছে। ইসলাম আমাদেরকে এই হকসমূহের শিক্ষা প্রদান করেছে।

ইসলাম ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অনুপ্রেরণা

ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট হল যে ইসলাম আমাদেরকে অন্যকে প্রাধান্য দিতে শিখিয়েছে। 'ইসার' বলা হয় নিজের প্রয়োজনকে কোরবান করে অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ করা।

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তারা অন্যেকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয় যদিও তারা প্রচন্ড অভাব-অনটনে থাকে।

হযরত বাকী বিল্লাহ্ রহ: এর ঘটনা, তিনি সমরকন্দের বাসিন্দা ছিলেন। এক রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠলেন। প্রচন্ড ঠান্ডা ছিল, শীতে কাপছিলেন। প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে নামাযের মুসল্লা থেকে উঠে বিছানায় যাওয়ার জন্য উদ্দ্যত হলেন, দেখতে পেল যে একটি বিড়াল তার বিছানায় ঢুকে গেছে। তিনি চিন্তা করলেন যে, বিড়ালের ঘুম নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাই নামাযের মুসল্লায় বসে বাকী রাত ঠান্ডায় কাটিয়ে দিলেন।

এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি সুসংবাদ পেলেন। এক বড় ব্যক্তিত্ব তার হাতে বাইয়াত হবেন। তিনি দেখলেন মুজাদ্দীদে আলফে সানী রহ: এর মত বুযুর্গ তার হাতে বাইয়াত হয়েছেন। আমাদের আকাবিররা একটি প্রাণীর প্রয়োজনকেও নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

কেউ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ: কে প্রশ্ন করল, হযরত আপনি মসনবী শরীফ লিখেছেন তাতে মারেফাতের বহু বিষয় জমা হয়ে গেছে। এত মারেফত আপনি কিভাবে হাসিল করলেন? তিনি বললেন, একটি কুকুরের কারণে। প্রশ্ন করা হল এটি কিভাবে? তিনি বললেন, একবার আমি কোথাও যাচ্ছিলাম, রাস্তায় একটি কুকুর শোয়া ছিল। আমি ভাবলাম কুকুরের পাশ দিয়ে গেলে কুকুরের ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি কিছুক্ষণ থেমে গেলাম। কিছুক্ষণ পর কুকুরটি এমনিতেই চলে গেল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে এমন ঢেলে দিলেন যে তুমি একটি কুকুরের আরামের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছো এর বিনিময়ে আমি তোমাকে আমার মারেফত দিয়ে দিলাম। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুখ থেকে অসংখ্য মারেফতের কথা বের করেছেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয় আমরা স্ত্রীর ঘুমের প্রতি খেয়াল করি না, পিতা-মাতার ঘুমের প্রতি খেয়াল করি না, বাচ্চাদের খেয়াল করি না। আমরা

ঘরে প্রাণীর মত বাস করি। আমাদের আকাংখা থাকবে যে আমরা ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করব, তাহলে দুনিয়াতে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকব, আখেরাতেও উঁচু মাকাম পেয়ে যাব।

সততার ধর্ম

ইসলাম সততার ধর্ম। মানুষকে সত্যবাদী জীবন যাপনের শিক্ষা প্রদান করে। মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে। নবী কারীম সাঃ ইরশাদ ফরমান–

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।

সত্য বললে মানুষের জীবনের পেরেশানী দূর হয়ে যায়। আমাদের বুযুর্গরা বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল না করা ছেড়ে দিবেন। ইসলাম সত্যবাদী জীবন যাপনের শিক্ষা প্রদান করে। আমাদের আকাবীররা এত স্বচ্ছ জীবনের অধিকারী ছিলেন যে আশ্চর্য লাগে। কিছু ঘটনা আপনাদের শুনাচ্ছি।

মুসলমানরা হেরে গেছে ইসলাম জিতে গেছে

কান্দালা নামক ছোট গ্রামে হিন্দু-মুসলমান একসাথে বসবাস করত। সেখানে একটি যমীন নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মাঝে ঝগড়া বাধে (দ্বন্ধ) লাগে। মুসলমানদেরও দাবী এই যমীন আমাদের, হিন্দুদের দাবী এটি আমাদের। যখন ঝগড়া আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল তখন মুসলামানরা ঘোষণা দিয়ে দিল যে, এটি আমাদের ভূমি, আমরা এখানে মসিজদ নির্মাণ করব। হিন্দুরাও বলল, আমরা এখানে মন্দির বানাব। দুই ধর্মের ঝগড়া লাগল। পুরো শহরে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ একে অপরকে হত্যা করার উপক্রম হল। আদালতে মামলা দায়ের করা হল। মেজিস্ট্রেট ছিল ইংরেজ। সে চাইল, পরস্পরে তারা মীমাংসা করে নিক। সে উভয় দলকে জিজ্ঞাসা করল যে এমন হতে পারে? যে তোমাদের পরস্পরের মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হয়ে যাক?

উপস্থিত হিন্দুরা বলল, একজন মুসলমান আছে, তার থেকে সাক্ষী নেওয়া যেতে পারে। যদি সে বলে এই যমীন হিন্দুদের তাহলে আপনি যমীন হিন্দুদের দিয়ে দিন। আর যদি মুসলমানদের বলে, তাহলে আপনি মুসলমানদের দিয়ে দিন। ইংরেজ বিচারক তারিখ র্নিধারণ করে দিল, অন্যান্য হিন্দুরা তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগল যে তোমরা একজন মুসলমানকে শালিস নিযুক্ত করেছ? সে তো মসজিদ বানানোর কথাই বলবে। তোমরা মামলায় প্রথমেই হেরে গেছো। তোমরা বড় খারাপ কাজ করেছো। নির্ধারিত তারিখে হিন্দু-মুসলমান উভয় দল আদালতে হাযির হলে ইংরেজ জজ হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ: এর শাগরেদদের মধ্য থেকে বড় বুযর্গ মুফতী ইলাহী বখশ কান্দলভী রহ: কে ডাকল। তাকে জিজ্ঞাসা করল এই যমীন কার? মুসলমানদের আশা ছিল যে সে বলবে, এটি মুসলমানদের যাতে আল্লাহর ঘর র্নিমাণ করা যায়।

মুফতী সাহেব বললেন, এই যমীন হিন্দুদের। জজ সাহেব তাকে বলল, হিন্দুরা কি এখানে মন্দীর র্নিমাণ করতে পারবে? তিনি উত্তরে বললেন, মালিক যেহেতু তারা তাই তারা যা ইচ্ছা তাই বানাতে পারবে। জজ সাহেব এক আশ্চর্য ফায়সালা দিলেন। তিনি মামলার রায় শুনাতে গিয়ে বলেন, আজকে এই মামলায় মুসলমানরা হেরে গেছে; কিন্তু ইসলাম জিতে গেছে। জজ সাহেব ফায়সালা দেওয়ার পর হিন্দু বলল, এখন আমাদের ফায়সালা শুনুন। যেহেতু ইসলাম এতই সত্যবাদীতা শিক্ষা দেয়, তাই আমি কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম। আমি এখানে মসজিদ বানানোর ইচ্ছা করলাম। ইসলাম সত্যবাদীতা শিখানোর ধর্ম।

লজ্জাশীলতার ধর্ম

ইসলাম লজ্জাশীলতার ধর্ম। লজ্জাশীলতা এমন গুণ যা কেবলমাত্র ইসলামেরই সৌন্দর্য। হাদীসে এসেছে যে اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ লজ্জা ঈমানের অংশ। إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءَ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ যখন লজ্জা শেষ হয়ে যাবে, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

—৩

লজ্জা নারীর ভূষণ

ইসলাম লজ্জাশীলতাকে মহিলার সৌন্দর্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। যে, মহিলার মাঝে লজ্জাশীলতা বেশী থাকে তার সৌন্দর্যও তত বেশী হয়ে যাবে। এটি নেকী, তাকওয়া, ভদ্রতা ও লজ্জাশীলতার সৌন্দর্য। এটি আকৃতির সৌন্দর্যের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর হয়ে থাকে। লজ্জা ইসলামের শিক্ষা। এই কারণে পিতা-মাতা সন্তানের সামনে নিজেদের ভাবমূর্তি বজায় রেখে চলে, যাতে করে তাদের থেকে এমন কোন আচরণ প্রকাশ না পায় যা দ্বারা তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়।

লজ্জাহীনতার ফলাফল

অমুসলিম দেশে এই বিষয়টি একেবারেই নেই। আপনি অমুসলিম দেশে গেলে দেখতে পাবেন পিতা-মাতা সন্তানের সামনে অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। পুরুষ-মহিলার এই খবর থাকে না যে তাদের কেউ দেখছে কি দেখছে না। এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, ড্যান্স পার্টি হয়, পাঁচশত পুরুষ মহিলা একসাথে নাচানাচি করে, সেক্স করে। ফলে একে অপরের পরোয়া করে না। ইহা মনুষত্ব নয় পশুত্ব। এর ফলাফল হল, তাদের পুরুষ মহিলার মেলামেশা এত খারাপ হয়ে গেছে যে তারা ফ্রী সেক্স করা শুরু করে দিয়েছে। মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় যে, এ রকম পশুর কাজ কি মানুষ ও করতে পারে। তারা পশুকেও হার মানিয়েছে। লজ্জাশীলতা এমন একটি গুণ, এমন এক নিয়ামত যার শিক্ষা ইসলামেরই সৌন্দর্য।

ইসলামে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার শিক্ষা

ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার শিক্ষা দান। বান্দা যে কাজই করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে, যদি খেদমতও করে, অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য করে না, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে। যদি কোন ধনী কোন গরীবকে কিছু দান করে তা ইহসান দেখানোর জন্য নয় বরং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করা। এটি

আশ্চর্য একটি শিক্ষা। সুবহানাল্লাহ!এই শিক্ষা ইসলামই দিয়েছে। আমাদের আকাবিররা একনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন। আল্লাহ্‌কে খুশি করার নিয়তে কাজ করতেন। মাদায়েন বিজয়ের পর যুদ্ধের অবসান হলে সেনাপ্রধানের কাছে একজন সৈনিক আসল, যার শরীরে একেবারে সাধারণ কাপড় ছিল, তার বেশ-ভূষা ও সাধারণ ছিল। সে কাপড়ের ভিতরে কিছু লুকিয়ে রেখেছে। কাপড় থেকে কিছু একটা বের করে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি. কে দিলেন। কাপড় সরালে দেখা গেল, তাতে মাদায়েন শহরের বাদশার রাজ-মুকুট ছিল। যুদ্ধে বাদশাহ মারা গেলে তিনি মুকুটটি যত্ন করে রেখেছেন। বাদশাহর মুকুট অনেক মূল্যবান ছিল, এতে মূল্যবান হীরা ও মনি মুক্তা ছিল। একটি হীরা বিক্রি করলে তার সারা জীবন শান্তিতে কাটত। কেউ বুঝতেও পারত না যে এটি কার? কিন্তু তার অন্তরে ইখলাস ছিল, আল্লাহর ভয় ছিল, যে এটি আল্লাহর আমানত। আমি তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছি। সেনাপ্রধান আশ্চর্য হয়ে যুবককে তার নাম জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু যুবক তার চেহারা ফিরিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, যে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য আমি কাজ করেছি তিনি আমার নামও জানেন আমার বাবার নামও জানেন।

ইখলাসের সাথে সন্তান পিতা-মাতার, স্ত্রী-স্বামীর খেদমত করবে, স্বামী স্ত্রীকে খুশি রাখবে। হাদীসে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এক বান্দাকে ডেকে বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে আহার দাওনি, আমি পিপাসার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি পান করাওনি, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার খবর নাওনি। বান্দা বলবে হে আল্লাহ! আপনি কি বলছেন? আপনি তো ক্ষুধা লাগা, পিপাসার্ত হওয়া, অসুস্থ হওয়া থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন, অমুক স্থানে তোমার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত ছিল, তাকে খাওয়ালেই আমাকে খাওয়ানো হয়ে যেত। তুমি প্রতিবেশীকে পানি করালেই আমাকে পান করানো হয়ে যেত। যদি তোমার প্রতিবেশীকে অসুস্থতার সময় দেখাশুনা করতে যেন আমারই দেখাশুনা করতে। ঐ দিন বুঝা যাবে ইসলামী শিক্ষা কত কল্যাণ নিহিত।

ইসলাম প্রীতি প্রকৃত থাকা চাই

কিছু বিষয় এজন্য আলোচনা কর হল, যাতে এই অনুভূতি অন্তরে বসে যায় যে আমরা শুধুমাত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে মুসলমান নয়, বরং পড়ালেখা করে জেনে শুনে আমরা বলছি, যে ইসলাম আমাদের জীবনের ধর্ম, আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি। ইসলামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা থাকতে হবে। এমন যাতে না হয় যে মুসলমান পরিচয় দিতে শরম লাগে, নাম বলতে শরম লাগে, নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিতে অপরাধী মনে হয়। বরং মহব্বতের সাথে নিজেকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অন্তরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। ইসলাম নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এর আদেশ প্রদান করেছে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতে কি হেকমত নিহিত? এটি আলাদা ব্যাপক শিরোনামের বিষয়। তবে সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ বিষয় মনে রাখবেন, যে আপনি মুসলমান হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন, এর জন্যে মনে মনে খুশি থাকবেন। ইসলামের প্রতি এমন ভালোবাসা রাখবেন যে আমার শরীর থেকে জান বের হতে পারে কিন্তু ইসলামের মহব্বত বের হতে পারে না। এরকম মহব্বতের ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দিবেন।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

কিতাবে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু উলামায়ে কেরাম ও লিখেছেন, তাই আমিও বর্ণনা করছি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বুঝার বিষয়। মদিনা তাইয়্যীবায় এক যুবক বাস করত। যুবকটি খুব উদাসীন ছিল। খাবার-দাবার পোশাক-পরিচ্ছেদ সর্বক্ষেত্রেই কাফেরদের মত ছিল, যদিও মুখে কালিমা পাঠ করেছে। মৃত্যুর পর তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হল। আল্লাহর কি শান! দাফনকারী লোকদের একজনের পকেট থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দাফনের সময় পড়ে গেছে, যেহেতু কাগজটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে কবর খনন করল। কবর খননের পর আশ্চর্যের সীমা রইল না। কবরে যুবকের পরিবর্তে এক

ইংরেজ মেয়ে পাওয়া গেল। ছবি তুলে পত্রিকায় প্রচার হলে ইউরোপের এক লোক জানালো যে এটি তার মেয়ের ছবি। তার সাথে সাক্ষাৎ করা হলে, সে বলল, কিছুদিন আগে আমার মেয়ে ইন্তেকাল করেছে। আমরা তাকে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে দাফন করেছি। এখানে প্রশাসন থেকে অনুমতি নিয়ে মেয়ের কবর খনন করা হলে, তদস্থলে মদিনার ঐ লোককে পাওয়া গেল। ইংরেজকে প্রশ্ন করা হল, আপনি কি কিছু জানেন? সে বলল, আমি কিছুই জানি না। তবে এতটুকু জানি যে সে কিছুদিন যাবত ইসলামী কিতাবাদী পড়া শুরু করেছে। সে বলছে, যে আমি ইসলামকে ভালোবাসি। মনে হয় সে কালিমাও পড়ে নিয়েছে। তখন লোকদের বাস্তবতা বুঝে আসলো, সে যুবক যদিও মদিনার বাসিন্দা, জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাফেরদের রীতি-নীতি পছন্দ করত, তাই আল্লাহ তাআলা তাকে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে পৌঁছে দিলেন। এটি যদিও পত্রিকার ঘটনা তবে আমাদেরকে বুঝার জন্য যথেষ্ট যে, আমরা অন্তরে আল্লাহর মহব্বত রাখবো। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব এবং ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দশটি শর্তের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, যাতে আমাদের ক্ষমা নিশ্চিত হয়ে যায়, এবং তার আনুগত্যশীল বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই।

দ্বিতীয় শর্ত

ঈমান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

ক্ষমার প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে ইরশাদ ফরমান,

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

কোরআন শরীফের এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ মহিলা উভয়কে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান, অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরষ ও বিনীত নারী, সওমপালনকারী পুরুষ ও সওমপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এই আয়াতে কারীমায় দশটি শতের্র বয়ান করা হয়েছে। যদি পুরুষ-মহিলা নিজেদের মাঝে এই দশটি শর্ত সৃষ্টি করে নেয় তবে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মাগফিরাত লাভে ধন্য হবে। সুতরাং আমাদেরকে এই দশটি সিফাত হাসিল করতে হবে এবং নিজেদের ক্ষমার উপযুক্ত বানাতে হবে। মুসলিম নারী-পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা গত হয়েছে। হাদীসে এসেছে- اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান ভাই নিরপাদ থাকে। হাদীসে যবান ও হাতের আলোচনা এই জন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত এই দুটি অঙ্গ দ্বারা অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়। হয়ত যবান দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়, অথবা হাত দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়।

এই দুটির মধ্যে যবানের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেহেতু অধিকাংশ যবান দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়। এবং যবানের আঘাত তরবারীর আঘাতের তুলনায় অধিক তীব্র হয়ে থাকে। কারণ হাত দ্বারা শুধু উপস্থিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া আর যবান দ্বারা অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও কষ্ট দেওয়া যায়।

মাগফিরাতের দ্বিতীয় শর্ত ঈমান

আল্লাহ বলেন,

وَالمؤمنين والمؤمنات ইমানদার নারী-পুরুষ

ঈমান বলা হয়, নবী কারীম সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, অন্তর দ্বারা তা বিশ্বাস করা, যবান দ্বারা স্বীকারোক্তি প্রদান করা, এবং অঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيق بالقلب وعمل بالاركان আল্লাহকে মানা, রাসুল সা. এর রেসালাতের সত্যায়ন

করা। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা। ফেরেস্তাদেরকে মানা। কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনা, ভালো-মন্দের তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা। মোটকথা নবী কারীম কর্তৃক আনীত সমস্ত বিষয়ে যবান দ্বারা স্বীকারোক্তি প্রদান করা, অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করার নাম ঈমান। ইসলামের সম্পর্ক বাহ্যিকতার উপর আর ঈমানের সম্পর্ক অভ্যন্তরের সাথে। ইসলামের সম্পর্ক শরীরের সাথে ঈমানের সম্পর্ক আত্মার সাথে।

ঈমানের মূল্য

এই ঈমান এতই দামী যে, যদি কোনো বান্দা কালিমা পাঠ করে ঈমান আনে, তবে এক ফেরেশতা তার এই আমলকে আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য আসমানের দিকে ছুটে যায়। পথে অপর ফেরেশতারা তাকে প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তর দেয় আল্লাহর এক বান্দা কালিমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তার এই আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য যাচ্ছি। তারপর প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করে তুমি নীচে কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তর দেয়, যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করেছে, তার জন্য পুরস্কারের পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং যে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হল আল্লাহ তার সব পাপ মাপ করে দেন। اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَاقَبْلَه ইসলাম পূর্বের সকল পাপ মোচন করে দেয়। সুতরাং বান্দার কাছে সবচাইতে দামী বস্তু হল ঈমান।

সবেচেয়ে দামী জিনিস

আমাদের কাছে যে সকল জিনিস আছে তার মধ্যে সম্পদ প্রথম পর্যায়ে রয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে ও সম্পদের মূল্য রয়েছে। এই কারণেই তো সম্পদ নষ্ট করতে বারণ করেছেন। অপচয় করাকে কবীরাগুনাহ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সম্পদের তুলনায় মানুষের জীবন আরও দামী। এই কারণেই তো অসুস্থ হয়ে পড়লে সুস্থতার জন্য জীবনের সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করে। বুঝা গেল জীবন মালের তুলনায় মূল্যবান। কিন্তু জানের তুলনায় ইজ্জত আব্রু মানুষের নিকট আরও দামী। এই জন্য তো ইজ্জত আব্রু

রক্ষার জন্য মানুষ জীবন বিসর্জন দেয়। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। সুতরাং প্রথম হল ধন-সম্পদ, তারপর জান, তারপর ইজ্জত আব্রু। কিন্তু মানুষের ঈমান এই সবকিছু থেকে দামী। ঈমান অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস মানুষের নিকট মূল্যবান কিছুতেই হতে পারে না। এই অনুভূতি আমাদের থাকতে হবে, অন্যথায় যদি কারো কোনো বস্তুর মর্যাদা ও মান সম্পর্কে ধারণা না থাকে তবে সে এই বস্তু ধ্বংস করে বসবে।

পার্থিব স্বাদ ও চাকচিক্যের হাকীকত তথা বাস্তবতা

শেখ সাদী রহ. নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, শৈশবকালে আমার মা একটি স্বর্ণের আংটি আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। ঘর থেকে বের হলে এক প্রতারকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে চকোলেট জাতীয় মিষ্টি জিনিস ছিল। সে আমাকে একটি মিঠাইয়ের অংশ দিয়ে বলল, ইহা মুখে দাও। আমি তাই করলাম। তারপর বলল, তোমার আংটিটা মুখে দাও। আমি মুখে দিলাম। কোন স্বাদ পেলাম না। প্রতারক আমাকে বলল, মজাদার মিঠাই নিয়ে আমাকে বেমজাদার আংটিটি দিয়ে দাও। আমি তার কথামত তার সাথে ব্যবসা করে ফেললাম। কারণ আংটির মূল্য আমার অনুধাবনের বাইরে ছিল। হুবহু এমনই হয়ে থাকে শয়তান ও আমাদের মাঝে। শয়তানও একজন প্রতারকের মতো। যদি আমরা ঈমানের মূল্য বুঝতে না পারি সে আমাদেরকে দুনিয়ার স্বাদে মগ্ন করে ঈমানী সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দিবে। আর যদি মানুষ ঈমানের মূল্য বুঝে, তবে সে জান কোরবান করতে পারে কিন্তু ঈমান কোরবান করতে পারে না। নবী কারীম সা. এক সাহাবীকে বললেন, ঈমানের উপর অটল অবিচল থাক, যদিও তোমাকে শুলিতে চড়ানো হয় অথবা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

সন্দেহ আর ঈমান এক নয়

স্মৃতিপটে এই বিষয়টি বদ্ধমূল করতে হবে যে, ঈমান বলা হয় না দেখে মানাকে। এই কারণে তার মূল্য অনেক বেশী। এই কারণে কারো মনে

সন্দেহ ঢুকালে ঈমান খতম হয়ে যায়। নবী কারীম সা. শিরকের পূর্বে সন্দেহ থেকে পানাহ চেয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সন্দেহ, শিরক, বিদ্বেষ, কপটতা এবং বদ আখলাক থেকে পানাহ চাচ্ছি।

দেখুন, সন্দেহ এত মারাত্মক বিষয়, যে কারণে কোরআনের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ এই কিতাবে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এই কোরআন মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক। এই কারণে যদি কারো অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে সে কোরআন দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে না। কোরআনের কোনো কথা তার কাজে আসে না। সন্দেহ ঈমানকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমন সিরকা মধুকে ধ্বংস করে। নারীরা অনেক ক্ষেত্রে বলে কে জানে পরকালে কি হবে? সন্দেহ খুব খতরনাক বস্তু। ভাই সন্দেহ করার কি দরকার আছে? নবী কারীম সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নেককার মানুষের সাথে কি আচরণ করা হবে, বদকার মানুষের সাথে কি আচরণ করা হবে এর বর্ণনা করেছেন। একথা বলা যাবে না দুনিয়া মজাদার, আখেরাতকে কেউ দেখেনি।

তাই নবী কারীম সা. মে'রাজের রজনীতে উর্ধ্ব ভ্রমণ করে দুনিয়াতে এসে সব বর্ণনা করেছেন, যে জান্নাতের অবস্থা এমন, জাহান্নামের অবস্থা এমন। আমাদের এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি।

ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হওয়া উচিত

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ভীষণ মজবুত ছিল। হযরত আলী রাযি. বলেন, জান্নাত-জাহান্নাম না দেখেও আমার নিকট দেখার মত, যদি সরাসরি জান্নাত-জাহান্নাম আমাকে দেখানোও হয় তারপরও আমার বিশ্বাস নতুন কিছু যোগ হবে না। সুতরাং আমাদেরকে মজবুত ঈমান রাখতে হবে,

যেমন আমাদের পায়ের নীচের যমীন সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলব, আমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল, আসমানী কিতাবসমূহ, কিয়ামত দিবসের উপর, পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করছি তবেই তাকে ঈমান বলা হবে। হাদীসে নবী কারীম সা. সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সন্দেহ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাই তো ইমাম আবু হানিফা রহ. কে প্রশ্ন করা হল আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, أَنَا مؤمن حقا আমি পাক্কা মুমিন। ইমাম শাফী রহ. কে প্রশ্ন করা হল আপনি কি মুমিন? তিনি উত্তরে বললেন, أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاء الله ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন। মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলেছেন। যে আমার আশা আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময়ও আমাকে ঈমানের উপর অটল রাখবেন। তবে ইমাম আবু হানিফার ঈমান আরও মজবুত ছিল। সুতরাং আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তবে আমরা বলব, আমরা পাক্কা মুমিন। আমরা আল্লাহকে মানি, আল্লাহর দ্বীন মানি, এতে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই। এই মজবুত ঈমানের কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। কারণ আল্লাহর নিকট নেক বান্দার ঈমানের বিশাল মূল্য রয়েছে।

সাক্ষ্যদানের পুরস্কার

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আ. এর যামানায় দুর্ভিক্ষ চলাকালে এক যুবক তার দরবারে এসে লোকদের কাছে গম চাইলে তাকে গম দেওয়া হল। সে বলল, আমার আরও লাগবে। তাকে আরও দেওয়া হল, যুবক বলল, হবে না আরও লাগবে। লোকেরা বলল, তোমার যদি আরও প্রয়োজন হয় তবে তুমি ইউসুফ আ. এর কাছে যাও। তিনি স্বাধীন তার ইচ্ছামতো দেওয়ার অধিকার আছে। সে হযরত ইউসুফ আ. এর কাছে গম চাইলে ইউসুফ আ. তাকে পূর্বের সমপরিমাণ গম দিতে কর্মচারীকে আদেশ প্রদান করলেন। তাকে গম দেওয়া হল, সে ইউসুফ আ. এর কাছে পুনরায় আবেদন জানাল যে হযরত, আমার আরও লাগবে।

হযরত ইউসুফ আ. বললেন, হে যুবক! কর্মচারীরা তোমাকে গম দিল, আমিও দিলাম, তারপরও তোমার প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে না! যুবক বলল, হযরত! যদি আপনি আমাকে চিনতেন আমি কে? তাহলে আরো বেশী দিতেন। হযরত ইউসুফ আ. আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? সে বলল, আপনার উপর জুলাইখার অপবাদের বিরুদ্ধে যে শিশুটি আপনার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিল আমিই সেই শিশু। আজ যুবক হয়ে আপনার কাছে এসেছি। হযরত ইউসুফ আ. তার কথা শুনে ভীষণ খুশী হলেন, এবং তার কপালে চুমু খেলেন। কর্মচারীদেরকে আরও অধিক পরিমাণ গম দিতে নির্দেশ প্রদান করলেন, এবং সেগুলো তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। যুবক সম্মানের সাথে বিদায় নেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, হে আমার প্রিয় ইউসুফ! আপনি এই যুবককে অনেক সম্মান করেছেন। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! এই যুবক আমার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, আজ সে আমার নিকট এসেছে, তাই আমার মন চাইলে আমি যা দিতে পারি যুবককে দিয়ে দেই।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আমার ইউসুফ! সাক্ষী থাক, যে তোমার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছে অত:পর যখন তোমার নিকট এসেছে, তুমি তাকে তোমার সাধ্য মোতাবেক দিয়েছো। আমি পরওয়ারদিগারও ঘোষণা দিচ্ছি যে, যে বান্দা আমার একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করবে, অত:পর কিয়ামত দিবসে যখন সে আমার নিকট আসবে, আমি তাকে আমার শান মোতাবেক পুরস্কার প্রদান করব।

না দেখে মানার নাম ঈমান

আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হব, রিসালাতের উপর ঈমান আনব, আল্লাহর দ্বীন কবুল করব। আল্লাহর নিকট এর বিশাল মর্যাদা রয়েছে। এটি কোন ছোট বিষয় না। আর বিশাল মর্যাদা তো এই কারণে, যে আল্লাহ তা'আলাকে না দেখে মানা হচ্ছে। কারণ মানুষ যখন দেখে ফেলে, তখন ঈমান কোন কাজে আসে না। যেমন ফেরাউন মৃত্যুর সময় আখেরাতের দৃশ্য অবলোকন করে বলে ফেলল– أَمَنْتُ بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى

আমি হারুন ও মুসার রবের উপর ঈমান এনেছি। তবে তা ঈমান ছিল না। মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়ে গেছে, তাই এর কোন মূল্য থাকল না। বলা হলো সময় শেষ হয়ে গেছে। আর আমরা না দেখে মানি এই কারণে আমাদের ঈমানের মূল্য অনেক বেশী।

না দেখে ব্যবসা

একটি ঘটনা শুনলে বিষয়টি দ্রুত বুঝে আসবে, কিতাবে এই ঘটনা লেখা আছে, হারুনুর রশিদ এর জমানায় এক বুজুর্গ ছিল, যার নাম ছিল বাহলুল দানা রহ.। একদা হারুনুর রশিদ তার স্ত্রীকে নিয়ে শাহী মহলের পিছনে নদীর কিনারায় বিনোদন করতে গেলেন। তিনি দেখলেন, বাহলুল শিশুদের মতো বালু দিয়ে ছোট ছোট ঘর বানাচ্ছে। হারুনুর রশিদ বাহলুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাহলুল তুমি কি করছ? বাহলুল উত্তর দিল, বালু দিয়ে ঘর বানাচ্ছি, যে এই ঘর ক্রয় করবে, আমি তা জন্য দোয়া করব, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত প্রদান করবেন। বাদশাহ তাকে ঘরের মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, এই ঘরের মূল্য এক দিনার। হারুনুর রশিদ ভাবলেন, এখন সে তার পাগলামীর অবস্থায় রয়েছে, এই কারণে তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে সামনে চলে গেলেন। পিছন থেকে তার স্ত্রী যুবাইদা এসে তাকে প্রশ্ন করল, বাহলুল কী করছ? সে উত্তর দিল ঘর বানাচ্ছি। যে এই ঘর যে কিনবে আমি তার জন্য দু'আ করে দিব, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে ঘর দান করবেন। যুবাইদা মূল্য জিজ্ঞেস করল, সে বলল, এক দিনার। যুবাইদা তার কথার উপর ইয়াকীন করে তাকে দিনার দিয়ে দুআর আবেদন করে সামনে চলে গেল।

হারুনুর রশীদ রাত্রে স্বপ্নে জান্নাতের দৃশ্য দেখল এবং ভিতরে একটি ঘরের সামনে যুবাইদার নাম দেখে সে চিন্তা করল যেহেতু এটি আমার স্ত্রীর ঘর তাই আমি প্রবেশ করতে পারি। দরজার কাছে গেলে দারোয়ান তাকে বাধা দিল এবং বলল, আপনি কে? সে বলল, যার নাম এই ঘরের সাইনবোর্ডে লেখা আমি তার স্বামী। দারোয়ান বলল, দুঃখিত এখানকার নিয়ম হল, যার নাম লেখা সেই প্রবেশ করতে পারবে, অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আপনি চলে যান।

যখন দারোয়ান তাকে ফিরিয়ে দিল তখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ভীষণ ব্যথা পেলেন, হায় আফসোস! তখন তো দু'আ কবুলের সময় ছিল। বাহলুল এর দু'আ কবুল হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী বড়ই বুদ্ধিমান, সে এক দিনার দ্বারা দু'আ নিয়ে নিয়েছে, আর আমি দু'আ নিতে পারলাম না। সারাদিন বিষন্ন অবস্থায় কাটলো, একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কারণে। বাদশাহ চিন্তা করল আজ সন্ধ্যায় আবার যাব। সুতরাং সে পায়চারী করার জন্য বের হল। আল্লাহর কি শান! বাহলুল আগের মতোই আজ ঘর বানাচ্ছে। বাদশাহ বাহলুলকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাহলুল কি করছ? সে উত্তর দিল ঘর বানাচ্ছি, যে খরিদ করবে, তার জন্য আমি দু'আ করব, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ঘর প্রদান করবেন। বাদশাহ বলল, এর মূল্য কত? উত্তর দিল জনাব, এর মূল্য পূর্ণ দুনিয়ার বাদশাহী। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল হে বাহলুল! গতকাল তো এর মূল্য এক দিনার চেয়েছো, আর আজ সারা পৃথিবীর বাদশাহী চাচ্ছ, যা আমি তোমাকে দিতে পারবো না! বাহলুল উত্তর দিল, জাহাপনা! গতকাল ছিল না দেখে ব্যবসা। আর আজ হল দেখে ব্যবসা।

যেহেতু আমরা না দেখে আল্লাহর সাথে কারবার করেছি, তাই আমরা সস্তা মূল্যে জান্নাত পেয়ে যাব। এমনকি এক মুঠ খরচ করার বিনিময়ে জান্নাত পেয়ে যাব, একটি খেজুরের দানের বিনিময়ে জান্নাত মিলে যাবে। অনুতাপের সাথে এক ফোটা অশ্রু প্রবাহিত করলে এর বিনিময়ে জান্নাত মিলে যাবে। জান্নাতের মূল্য অনেক সস্তা, কারণ এটা না দেখে ব্যবসা। কিন্তু মৃত্যুর সময় দেখার পর কেঁদে কেঁদে সমুদ্র ভাসিয়ে দিলেও জান্নাত লাভ হবে না, কারণ ইহা ঈমান নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়ে গেছে। অতএব আমাদেরকে ঈমানের মূল্য বুঝতে হবে। এই কারণে আমাদের বুজুর্গরা বলেন, ঈমান দ্বারা জান্নাত লাভ হয়, আর আমল দ্বারা জান্নাতের দারাজাত বুলন্দ হয়।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا

প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুপাতে মর্যাদা লাভ করবে।

জান্নাতের চাবি ও তার দাঁত

কোন কোন বুযুর্গ বলেন, কালিমা হল জান্নাতের চাবি আর নেক আমল ওই চাবির দাঁত। যেমনিভাবে চাবির দাঁত সোজা মত না বসলে তালা খোলে না। তেমনিভাবে আসল চাবি হল কালিমা যদি নেক আমল দ্বারা তার দাঁতসমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়, তবেই দাঁতসমূহ সঠিক বসবে এবং জান্নাতের দরজা খুলবে। অতএব আমাদেরকে ঈমানের মূল্য বুঝতে হবে। এবং আল্লাহর ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে, যে তা শতভাগ সত্য এবং আমরা এর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখি।

পার্থিব প্রবঞ্চনা

আমরা দুনিয়াবী জীবনযাপন করে থাকি, পার্থিব জীবন আমাদেরকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, আমরা পার্থিব প্রতারণায় পড়ে যাই। মানুষ বলে থাকে লাইফকে ইনজয় কর, অর্থাৎ জীবন উপভোগ কর। না দেখে ওয়াদার বিষয় মানার দরকার নেই। যেহেতু মানুষের আত্মাও একথা বলে, শয়তানও একথা বলে, বন্ধু-বান্ধবদের আকৃতিতে যারা শয়তানের এজেন্ট তারাও একথা বলে সেহেতু মানুষ চিন্তায় পড়ে যায়, যে ধর্মে তো শুধু বাধ্যবাধকতা। কোনো কোনো মহিলাকে বলতে শোনা যায় শরীয়তে শুধু বাধ্যবাধকতা, পর্দাতে থাক, ইহা দেখা যাবে না, খাওয়া যাবে না। ভাই এই বাধ্যবাধকতা ক্ষণিকের জন্য, এর বিনিময়ে জান্নাতের নিয়ামতরাজি চিরস্থায়ী।

যুক্তি ও শরীয়ত

লক্ষ্য করুন একটি হল যুক্তির পথ ও অপরটি হলো খবরের (হাদিসের) পথ। যুক্তির পথ হলো যা আমরা চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে থাকি, আর খবরের পথ হলো শরীয়ত যা আমাদের বর্ণনা করে দিয়েছে। সুতরাং শরীয়ত আমাদের বলেছে যদি মানুষ যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু যুক্তি বলে প্রতি বছর যাকাত দেওয়ার দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায়। যুক্তি ধোঁকা দিয়ে থাকে।

আর খবর সত্য বলে থাকে। যুক্তি বলে দান সদকার দ্বারা সম্পদহ্রাস পায় আর শরীয়ত বলে দান-সদকার দ্বারা সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। মুমিন বান্দার আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।

সম্ভবনাময় বিভিন্ন কারণ ও নিশ্চিত কারণ

বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, কেউ অসুস্থ হলে হসপিটালে যায়। ধরুন কারো জ্বর হয়েছে, ইমারজেন্সির ডাক্তার লিখে দিল যে তার জ্বর হয়েছে, এখন জ্বরের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। তাকে বলা হয় Differential reason (সম্ভাবনাময় বিভিন্ন কারণ)। উদাহরণস্বরুপ জ্বর ইনফেকশনের কারণেও হতে পারে, আবার ভাইরাসের কারণেও হতে পারে। অথবা তার ম্যালেরিয়া হলো, এরও বিভিন্ন কারণ হতে পারে। এ কারণে তার বডি পরীক্ষা করা হয়, তাকে Confirmatory test (যাচাই পরীক্ষা) এর মাধ্যমে ধরা পড়ে যায় যে তার মেলেরিয়া হয়েছে। এই মেলেরিয়া যে পরীক্ষা হয়, এটিকে Definite reason (মূল কারণ) বলা হয়। আমরা দুনিয়ার দিকে তাকালে ও বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে আসে, যে এমন হতে পারে অথবা এমন হতে পারে। কিন্তু কোরআন হাদিসে এর বাস্তব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

দান সদকার দ্বারা সম্পদ বাড়ার ইয়াকীন

যেহেতু শরীয়তে সদকা করার দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধির কথা বলা আছে, তাই এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যুক্তির নিরিখে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দান কর, মসজিদ বানাও, মাদ্রাসা কর, তবে তোমাদের সম্পদ কমে যাবে, কিন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, কোন আল্লাহর বান্দা কি এমন আছেন, যিনি মাদ্রাসাও মসজিদ বানিয়ে কাঙ্গাল হয়ে পড়েছেন। আপনি এরকম দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবেন না। কিন্ত এমন লোক পাওয়া যাবে যারা বড় বড় কারবার পরিচালনা করতে করতে পরিশেষে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সদকা দ্বারা মাল

বাড়ে কমে না। নবী কারীম সা. এই বিষয়টি শপথ করে বলেছেন। সুতরাং এর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান থাকা জরুরী।

সততায় সম্মান বাড়ে

সত্য বলার দ্বারা মানুষের স্থায়ী সম্মান বাড়ে। সত্য বলার দ্বারা অপমান হতে হয় না এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। আজ এই বিষয়ে আমাদের পূর্ণ ঈমান না থাকায় আমরা সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে ফেলি। মহিলারা তো অনেক ক্ষেত্রে বলেই থাকে, আমরা তো মিথ্যা বলিনি, বাহানা বানিয়েছি। কমবখত শয়তান মিথ্যাকে বাহানা বানিয়ে দিয়েছে, যে কারণে মিথ্যার ব্যাপারে মুমিনের হৃদয়ে যে ঘৃণা রয়েছে বাহানা বলার কারণে সে ঘৃণা মুমিনের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেছে। অতএব আমরা বলব, বাহানা আমরা বানাব না, বাহানা মিথ্যা। আর মিথ্যার কারণে লাঞ্ছনা অবধারিত হয়। সততায় সর্বদা সম্মান মিলে এমনকি মানুষ ভুল করার পরেও যদি সত্য বলে আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে তাকে সম্মান দান করেন। এটি শরীয়তের আদেশ। মুমিনের এর প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকা চাই।

আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা

যে ব্যক্তির ইয়াকীন হলো আল্লাহ তা'আলাই রিযিক দান করেন, সে কখনো মিথ্যা কথা বলে উপার্জন করতে পারে না। ধোঁকাবাজি করতে পারে না। সে এমন কোন কাজ করতে পারে না যা অন্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ করে। বরং সে শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক কাজ করবে। এবং এই বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা। যদি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় তবে তার জীবন সহজ হয়ে যাবে।

হযরত মূসা আঃ এর একটি দৃষ্টান্ত

ঈমানের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য কোরআন মাজীদ থেকে কয়েকটি উপমা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। মনযোগ দিয়ে শুনুন। হযরত মূসা

আ. ফেরাউনের যাদুকরদের সামনে দাঁড়ালেন। যাদুকররা যমীনে রশি নিক্ষেপ করল।

কুরআন তার বিবরণ এভাবে দিয়েছে-

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى

তাদের যাদুর কারণে মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। এই অবস্থায় আকলকে প্রশ্ন করা হলে আকল বলবে, হাতে লাঠি নিয়ে মজবুত করে ধর। তোমার কাছে আসলে প্রহার করে মেরে ফেল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে লাঠি হাত থেকে যেন ছুটে না যায়, আবার ভেঙ্গেও না যায়। যদি হাত খালি হয়ে যায় সাপ কামড় দিবে। এটি আকলের দাবি। কিন্তু হযরত মূসা আ. আকল দিয়ে করণীয় ঠিক না করে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলেন, উপর থেকে পয়গাম আসল, হে আমার প্রিয় মূসা أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ আপনি আপনার লাঠি যমীনে নিক্ষেপ করুন। আকল এই সংবাদ শুনে হৈচৈ করে বলবে, এই লাঠিটিই তো জীবনের শেষ ভরসা ও হাতিয়ার ছিল। যদি লাঠিটি যমীনে নিক্ষেপ করা হয়, তবে খালি হাত দ্বারা কি করা যাবে?

কিন্তু তিনি আল্লাহর পয়গাম্বর। আল্লাহ তাআলা যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাই করেছেন। তিনি লাঠি যমীনে ফেলে দিলেন, লাঠি সাপে পরিণত হয়ে যাদুকরদের সব সাপ খেয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. কে কামিয়াবী দান করলেন। কামিয়াবী যুক্তিতে নয় বরং কামিয়াবী শরীয়তের পথে। শরীয়ত বলে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে প্রত্যাদেশ আসে তাতেই সফলতা নিহিত। সামনে একটু লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে নীলনদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে থেকে ফেরাউন তার বাহিনীসহ ছুটে আসছিল। কুরআনে বিষয়টি এভাবে এসেছে- قَالَ أَصْحٰبُ مُوْسٰى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ মূসার সাথীরা বলল, আমরা তো পাকড়াও হয়ে যাচ্ছি। كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ কখনো নয় আমার প্রতিপালক আমার সাথেই আছেন। অতিসত্বর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

যদি এসময় আকলকে প্রশ্ন করা হয়, এখন কি করা উচিত, আকল সাহেব বলবে, লাঠি মজবুতভাবে পাকড়াও কর। তোমাদের সামনে সমুদ্র পিছনেও সমুদ্রের মত লোক আসছে। সুতরাং লাঠি মজবুতভাবে পাকড়াও কর, ফেরাউনকে এমনভাবে প্রহার কর যাতে সে মরে যায় তোমরাও মুক্তি পাও। কিন্ত হযরত মূসা আ. আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পথ দেখালেন। أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الحجر হে মূসা! তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। আকলকে এ অবস্থায় প্রশ্ন করা হলে, আকল হৈচৈ করে বলবে, পানিতে লাঠি মারার দ্বারা কী হবে? লাঠি যদি মারতে হয়, তাহলে ফেরাউনের মাথায় মারতে হবে। তবেই কিছু হবে। কিন্ত মূসা আ. বিবেকের নির্দেশনার প্রতি কোন তাওয়াক্কুল না করে আল্লাহর আদেশ পালন করলেন। ফলে সমুদ্রে ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। বণী ইসরাইল সে পথ দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। আর ফেরাউন সদলবলে সাগরে ডুবে মরল। অতএব প্রতিয়মান হল সফলতা শরীয়তের পথে আকলের পথে নয়।

হযরত মূসা আ. তাঁর সম্প্রদায়সহ তীহ উপত্যকায় পৌছলেন। সেখানে পানি না থাকায় তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে পানির আবেদন জানাল। এই অবস্থায় আকলকে প্রশ্ন করা হলে, আকল বলবে হাতের লাঠি দ্বারা কূপ খনন করা শুরু করুন, তার থেকে পানি নির্গত হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে লাঠি যেন ভেংগে না যায়। যদি লাঠি ভেংগে যায় তাহলে তোমাদের কাছে কিছুই থাকবে না। হযরত মূসা আ. আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম আসল। أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الحجر তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে প্রহার কর। আকল এই কথা শুনে হৈচৈ করে বলবে পাথরে লাঠি মারার দ্বারা তো লাঠি ভেংগে যাবে। যা আকাংখার শেষ হাতিয়ার তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্ত মূসা আ. পাথরের উপর লাঠি মারলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করলেন। অতএব জানা গেল, যা অবলোকন করা হয় তা ধোঁকা। আর যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তাই বাস্তব।

আল্লাহর ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে

যেহেতু আমরা মুমিন তাই আল্লাহর ওয়াদার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা থাকা উচিত। এই পথ থেকে সামান্যও সরা যাবে না। শতভাগ এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে হবে যে, শরীয়ত মোতাবেক আমল করার মাঝেই ফায়দা নিহিত। এর থেকে সরে গেলেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। মুমিন লাভ-লোকসানের দাস হতে পারে না। মুমিন তো কেবলমাত্র আল্লাহর দাস। আজ আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, যেখানে উপকার দেখা যায় সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েয ভুলে যাই। এটি মারাত্মক ভুল, ঈমানের দাবির বিরোধি।

আমাদেরকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা উচিত, এতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সফলতা নিহিত রয়েছে। আজ আমাদের অফিস, চাষাবাদ ও ব্যবসা থেকে রিযিক পাওয়ার আশা। আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক পাওয়ার আশা আমাদের নেই।

কবি বলেন,

بتوں سے امیدي خدا سے نااميدي * مجھے بتا تو سہي اور کافري کيا ہے

মূর্তির উপর তোমার আস্থা আছে, আল্লাহর উপর ভরসা নেই, তাহলে বাস্তবেই আমাকে বলতে হয় কুফরী কী? আমরা আসবাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু আসবাব সৃষ্টিকারীকে বিশ্বাস করি না। ইহাকেই কুফরী বলে। অতএব আমাদেরকে আল্লাহর সত্তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।

আকাবিরদের পূর্ণ ইয়াকীনের ঘটনাবলি

দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতি অষ্ট

হযরত কাসিম নানুতুভি রহ. দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর মূলনীতি অষ্ট লিপিবদ্ধ করেছেন, একটি মূলনীতি এই ছিল যে দারুল উলূমের জন্য স্থায়ি আয়ের কোন উৎস গ্রহণ করা হবে না। আমাদের অবস্থা হল, আমরা দু'আ করি হে আল্লাহ! মাদ্রাসার চলার জন্য কোন স্থায়ি আয়ের উৎস দিয়ে দিন, আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তাদের অবস্থা তো এই ছিল যে স্থায়ি কোন উৎসই গৃহীত হবে না। কেউ প্রশ্ন করল, হযরত! কেন গ্রহণ হবে না? আল্লাহ কাছ থেকে নযর সরে যাবে ফলে আল্লাহর সহযোগিতা খতম হয়ে যাবে। আমাদের বুযুর্গদের দৃষ্টি সব সময় আল্লাহর উপর ছিল।

ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছেন

হযরত ওমর রাযি.-এর যামানায় হযরত খালিদ বিন ওলীদ সেনাপ্রধান ছিলেন, যেদিকে যেতেন সেদিকেই বিজয়। হযরত ওমর রাযি. চিঠি লিখে তাঁকে বরখাস্ত করে সেনাপ্রধান নিয়োগ দিলেন এবং বলে দিলেন যদি এক বছর তুমি সাধারণ সিপাহী হয়ে যুদ্ধ করতে পারো তাহলে করো, অন্যথায় আমার কাছে মদিনায় ফিরে আস। খালিদ রাযি. এক বছর সাধারণ সিপাহী হয়ে যুদ্ধ করাকেই পছন্দ করলেন। পরবর্তীতে কেউ তাকে কেউ প্রশ্ন করল, যে এটি আপনার জন্য বড় কষ্টকর বিষয় হয়ে যাবে। একদিন পূর্বেই ত সেনা প্রধান, তার একদিন পরেই সাধারণ সৈনিক এবং আপনার কোন ভুলও ছিল না। তিনি উত্তর দিলেন, আমার কোন সমস্যা নেই। প্রশ্নকারী বলল, এটি কি করে সম্ভব? তিনি বললেন, যখন আমি সিপাহসালার ছিলাম তখনও ঐ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যুদ্ধ করেছি। এখন সাধারণ সৈনিক হয়ে সেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জিহাদ করব। আমার দৃষ্টিতে পার্থক্য মনে হচ্ছে না।

কেউ ওমর রাযি. কে প্রশ্ন করল, হযরত উম্মতের এত বড় সিপাহসালারকে আপনি কোন কারণ ছাড়াই বরখাস্ত করে দিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উম্মতকে এক সেনাপতির নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত করে তাদের বাঁচিয়েছি। প্রশ্ন করা হল ইহা কিভাবে? তিনি উত্তর দিলেন, খালিদ যেখানে যায় বিজয় লাভ করে, মানুষের হৃদয়ে এই কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, খালিদ যেখানেই যায় সেখানেই বিজয় সাধিত হয়। আমি তাকে বরখাস্ত করে একথা বুঝিয়ে দিয়েছি, বিজয়ের এই ধারা ইনশাআল্লাহ, অব্যাহত থাকবে। যাতে এমন অবস্থা না হয় নযর আল্লাহ থেকে সরে কোন বান্দার উপর না পড়ে। আমাদের আকাবিরদের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহর যাতের ওপর ছিল।

আমাদের অবস্থা

যদি আমরা আল্লাহর সত্তার উপর পূর্ণ আস্থা রাখি তবে কি একথা কখনোই বলতে পারি? যে মনে হচ্ছে আমাদের কারবারে কেউ বান দিয়েছে ইহা কতই না দুর্বল ঈমানদারের কথা। মহিলারা বলে, কেউ আমার স্বামীর ব্যবসা-বাণিজ্যে বান দিয়েছে, তাবিজ করেছে। যদি আল্লাহ তা'আলা কারো তাকদীরে রিযিক নির্ধারণ করে দেন কোন মাখলুক তা কিছুতেই আটকাতে পারে না। অথচ নিশ্চিত বলে দেয় যে, মনে হচ্ছে আমাদের কারবারে কেউ বান দিয়েছে। অনেক সময় বলে দেয় মেয়ের বয়স বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে কেউ মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে তাবিজ করেছে। আমাদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য শয়তান আমাদের মুখ থেকে ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক এ সকল কথা বের করে। যদি আল্লাহ কোন বান্দাকে কিছু দিতে চান, সমস্ত পৃথিবী মিলে তা রুখতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে কিছু না দিতে চান সমস্ত দুনিয়া মিলেও তা দিতে পারবে না। আমরা মানুষকে ক্ষুদ্র উপাস্য বানিয়ে নিচ্ছি। যাদু-মন্ত্রকারীরা কি রিযিক বন্ধ করতে পারে? কখনও নয়; বরং তারা বান্দার ঈমান ধ্বংস করে। অতএব এ ধরনের কথা কিছুতেই বলা উচিত নয়। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি কখনো বান্দাকে রিযিক প্রদান করেন, কখনো সংকীর্ণ করে দেন।

পাপের ক্ষতি

আমার কাছে অনেক লোক এসে বলে হযরত! মনে হচ্ছে কেউ আমাকে ক্ষতি করেছে। আমিও বলি হ্যাঁ বাস্তবেই কেউ কোন ক্ষতি করেছে। তখন প্রশ্ন করে কে ক্ষতি করেছে? আমি বলি, তোমাদের গুনাহ্ তোমাদের ক্ষতিসাধন করেছে। ভাই! মানুষ ক্ষতি করেছে এ ধারণা কেন করো? তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের রিযিক কমে গেছে, মেয়ের বিবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মুসিবতে আক্রান্ত করেন।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ তোমরা যে বিপদে আক্রান্ত হও তা তোমাদের হাতের কামাই।

অতএব স্মরণ রাখতে হবে, যে কেউ আমাদের পেরেশানীতে ফেলেনি, আমাদের গুনাহ্ আমাদেরকে পেরেশানীতে ফেলে। আমাদেরকে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।

বালা-মসীবত থেকে মুক্তির উপায়

কোন মসিবতে আক্রান্ত হলে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন, হে আল্লাহ্! আমি দুর্বল বান্দা, পরীক্ষা করলে পাশ করতে পারব না, হে পরওয়ারদিগার, এই বিপদ থেকে মুক্তি দিন। পেরেশানি দূর করে দিন। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন। অন্তর ব্যথিত হলে কুরআন তিলাওয়াত করা চাই। কুরআন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছেন। রাসুল সা. এর চিন্তিত হৃদয়ের জন্য প্রশান্তির কারণ হত। বর্তমানেও চিন্তিত ও পেরেশান হৃদয়ের জন্য কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষা অন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা নেই। সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল, তারা পেরেশানিতে পতিত হলে কোরআন তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন আমার উপর অপবাদ দেওয়ার পর আমি আমার বাবার বাড়িতে চলে গেলাম, ঘরে গিয়ে দেখি আমার পিতা

খাটে বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। আমরা বিপদের সম্মুখীন হলে তাড়াহুড়া না করে নফল নামাজ আদায় করব, একবার নামাজ পড়ে প্রশান্তি না পেলে আবার পড়ব, বারবার পড়ব, যেভাবেই হোক আল্লাহকে মানিয়ে নিব। পরিশেষে আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা আসবে। তিনি আমাদের অবস্থা আমাদের অনুকূলে করে দিবেন। এই বিষয়টি আমাদের শিখতে হবে। ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের মজবুত হতে হবে।

ঈমান থেকে মাহরুম হওয়া

হাদিসে এসেছে, আখেরী যমানায় এমন সময় আসবে, يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا মুমিন অবস্থায় সকাল, কাফের অবস্থায় সন্ধ্যা যাপন করবে। ঈমান থেকে এই মাহরুমী কিভাবে হবে? সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে। অতএব আমাদের ঈমানের ক্ষেত্রে মজবুত হতে হবে। আল্লাহর সত্তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

কেমন ইয়াকীন থাকা চাই

আশ্চর্যের বিষয় হল, স্বামী একটি কথা বললে স্ত্রী তা বিশ্বাস করে নেয়, ছেলে একটি কথা বললে মা তা বিশ্বাস করে নেয়, পিতা একটি কথা বললে মেয়ে তা বিশ্বাস করে নেয়, কিন্তু আমাদের নিকট আল্লাহর মর্যাদা এতটুকু নেই, যে তার কথা বিশ্বাস করতে পারি? এবং আল্লাহর নবীর মর্যাদা এতটুকু নেই যে, তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারি? অতএব আল্লাহর ওয়াদার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে, যে ইহা শতভাগ সত্য।

আল্লাহর উপর হযরত মূসা আ.-এর মায়ের কি পরিমাণ ইয়াকিন ছিল যে, তিনি স্বীয় পুত্রকে পানিতে ফেলে দিলেন, মনে মনে ঘাবড়াচ্ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান– وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰۤی اُمِّ مُوۡسٰۤی اَنۡ اَرۡضِعِیۡهِ ۚ فَاِذَا خِفۡتِ عَلَیۡهِ فَاَلۡقِیۡهِ فِی الۡیَمِّ وَ لَا تَخَافِیۡ وَ لَا تَحۡزَنِیۡ ۚ اِنَّا رَآدُّوۡهُ اِلَیۡكِ وَ جَاعِلُوۡهُ مِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ তুমি ভয় পেয়ো না বিচলিত হয়ো না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবও রাসূলদের অর্ন্তভুক্ত করব। দেখুন হযরত মূসা আ. ফেরাউনের ঘরে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অন্য মহিলাদের

দুধ হারাম করে পরিশেষে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। যখন হযরত মূসা আ. তার ঘরে পৌঁছে গেলেন, তখন ফেরাউন বলল, বাচ্চাকে ঘরে নিয়ে প্রতিপালন কর, এর খরচা তোমার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি। যাতে তার চক্ষু শীতল হয়, হতাশ হয়ো না। আর জেনে রাখ আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অধিকাংশ লোক জানে না। বুঝার চেষ্টা করে না। লক্ষ করুন! আমরা আজ সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠব যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এর উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমাদের চোখ ভুল দেখতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা ভুল হতে পারে না। যখন আল্লাহর উপর আমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করব তখন লাভ ক্ষতির মালিক কেবল আল্লাহকেই মনে করব। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে মাখলুক কোন ক্ষতি করতে পারে না। তাবলীগ জামাতের বন্ধুরাও একথা বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছু করতে পারেন আসবাব ছাড়া। আসবাব কিছুই করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া। সুতরাং আল্লাহর উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাহলে দেখতে পাবেন কিভাবে বরকত হয়।

হে আল্লাহ, আমাদের ঈমান বাঁচান

ঈমানের মূল্য বুঝার জন্য আপনাদের একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। ১৯৯৩ খৃঃ আমার সমরকন্দ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। একটি মসজিদে জুমা পড়ালাম। কিছু নওজওয়ান এসে তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাল, যে আমাদের মা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি মসজিদে অসংখ্য লোকদেরকে রেখে সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলাম। সমরকন্দের মুফতীয়ে আযম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হযরত অস্বীকার করবেন না, আমিও আপনার সাথে যাব। পথে আমি আপনার কাছে সব খুলে বলব, আমি বললাম, ঠিক আছে। যুবকদের সাথে তাদের ঘর অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। পথে মুফতীয়ে আযম আমাকে সব খুলে বললেন। হযরত! সমরকন্দে যখন বিপ্লব দেখা দিল, তাদের মা তখন

বিষ বছরের যুবতী মেয়ে ছিল, খুব পাক্কা ঈমানদার ছিল। যে সকল লোকেরা বাধ্য হয়ে নাস্তিক তথা কমিউনিস্ট হয়ে যেত সে তাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলে কালিমা পড়াত। আমার পিতা (মুফতী আজম) বড় পেরেশানীতে পড়ে যেতেন যে, সে যুবতী মেয়ে যদি তার বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর কাছে অভিযোগ করে তবে তার ফাঁসি হবে। তার ইজ্জত-আব্রু খতম হয়ে যাবে। কিন্তু সে বলতো, কেউ আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি আল্লাহর নামের প্রচার-প্রসার করব। এর জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিব। সে এতই মজবুত ছিল, যে সামান্যও ভয় পেত না। মহিলাদের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে দিনের প্রতি আহবান করত। সে হাজার হাজার মহিলার ঈমান বাঁচিয়েছে। আমরা সকল উলামায়ে কেরামও তাকে বোঝালাম, যে তুমি যুবতি মেয়ে, যদি পুলিশ বাহিনী শুনতে পারে তাহলে তোমার কি হাশর হবে, আল্লাহই ভাল জানেন। সে সামান্য ঘাবড়ায়নি। এবং বলল, আমি কারো কোন পরোয়া করি না। আমার জীবন, ইজ্জত-আব্রু কোন কিছুরই আমি পরোয়া করি না। আমার কাছে আমার ঈমান অধিক প্রিয়। আমি কেন মানুষকে ঈমানের প্রতি আহবান করব না। এভাবেই তার সত্তর বছর কেটে গেল। আজ তার বয়স নব্বই বছর। হাড্ডির আকৃতির মত হয়ে গেছে। সে শোনেছে বিদেশ থেকে কোন মেহমান এসেছে। তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে।

একারণে সে আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে। আমি যখন শোনলাম যে, সে বড় পূণ্যবান রমনী, যে তার যৌবনকাল আল্লাহর দাওয়াত দিয়ে কাটিয়েছে। হাজার হাজার মহিলার ঈমান বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাই তার কাছ থেকে দোয়ার আবেদন জানানোর ইচ্ছা করলাম। তার ঘরে পৌঁছলে উঠানে খাটের উপর হাড্ডির আকৃতি দেখতে পেলাম। পর্দার জন্য উপরে একটি কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমরা তার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' বলার পর, আবেদন করলাম আম্মাজান, আপনার খেদমতে এ জন্য হাজির হয়েছি যে, আপনার কাছে দোয়া চাইব। আল্লাহর বান্দি আমার কথা শোনার পর শোয়া অবস্থায় হাত উঠিয়ে আমার জন্য দোয়া করল।

দোয়ার প্রথম শব্দ এই ছিল

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের ঈমানের হেফাযত করুন। বিশ্বাস করুন ঐদিন আমার অন্তরে বদ্ধমূল হল যে ঈমান কতইনা দামী। যে মহিলা বিশ বছর বয়স থেকে আজ নব্বই বছর পর্যন্ত ঈমানের মেহনত করেছে আজও তাকে দু'আর জন্য বলা হলে তার দু'আর প্রথম শব্দ 'হে আল্লাহ, আমাদের ঈমানের হেফাজত করুন। তাহলে আশা করা যায় যে আমরা ঈমানের মূল্য বুঝতে পারব। আমরাও আমাদের দু'আয় বলব, হে আল্লাহ আমাদের ঈমানকে হেফাযত করুন। এই বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি হলে কেউ আমাদেরকে ঈমান থেকে হটাতে পারবে না।

ফেরাউনের যাদুকরদের ঈমান

যখন যাদুকরেরা ঈমান আনল, তখন ফেরাউন তাদেরকে বলল, আমি তোমাদের এক পাশের হাত কেটে দেব, অপর পাশের পা কেটে দেব। যাতে তোমরা চলতে ফিরতে না পার, বসতে না পার। কিছুই করতে না পার। তারা উত্তর দিল فاقض ما انت قاض তুমি যা করার কর, আমরা ঈমান থেকে পিছু হটব না। তারা জীবন কুরবান করে দিয়েছিল, কিন্তু ঈমান নষ্ট হতে দেয়নি।

বিবি আসিয়ার ঈমান

ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মোজাহীম হযরত মূসা আঃ এর প্রতি ঈমান এনেছিল। ফেরাউন তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। এক কিতাবে আছে, ফেরাউন তাকে জমিনে শুইয়ে হাত পায়ে পেরেক মেরে শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেলেছিল, সে সবকিছু সহ্য করেছে কিন্তু ঈমান থেকে পিছু সরে নি। সে একথা ভাবেনি যে আমি এই রাজ্যের ফাষ্ট লেডী, সম্রাজ্ঞী, স্বাচ্ছন্দে আরামে জীবন যাপন করতে পারব। ধন ভান্ডার আমার ইশারায় খুলে যাবে। কিন্তু সে দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে লাথি মেরে, ঈমানের আঁচল ছাড়েনি। বরং সে ঐ সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করল رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ

بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ হে আমার রব, আপনি জান্নাতে আপনার নিকটে আমার জন্য একটি বাড়ী বানান।

কমবখত ফেরাউন আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। ঘর থেকে বের করে দিলে মহিলারা ভীষণ কষ্ট পায়। আল্লাহর কাছে এই বিষয়টি এতই ভাল লেগেছে যে কারণে কোরআনে এটি উল্লেখ করেছেন। আজ নামাজেও আমরা এই তিলাওয়াত করছিলাম।

হায়, যদি মহিলারা বিবি আসিয়াকে নিজেদের মডেল বানিয়ে নিত। আসিয়ার মত মজবুত ঈমানের অধিকারী হত, যে আমরা দুনিয়ার সবকিছু কোরবান করে দিব, কিছুতেই ঈমান কোরবান করব না।

ঈমানের মূল্য

এক খৃস্টান বাদশাহ দুইজন তা'বীকে গ্রেফতার করে নিয়ে তাদেরকে বলল, হয়ত তোমরা তোমাদের ধর্ম/দ্বীন ছেড়ে আমাদের ধর্মে চলে আস, অন্যথায় আমি তোমাদেরকে গরম তেলে নিক্ষেপ করব। তারা বলল, কখনোই এমন হতে পারে না। বাদশাহ একটি পাত্রে তেল গরম করতে লাগল। যখন তেল ভালভাবে গরম হয়ে টগবগ করত লাগল, তাদের পুনরায় ঐ কথা বলল। কিন্তু তারা ঈমানের উপর অটল থাকলেন। সে তাদের একজনকে গরম তেলে ফেলে দিল। তেলে ঝলসিয়ে সে কাবাব হয়ে গেল। অপর জনের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। বাদশাহ ভাবল যে সে ভয় পেয়েছে। এখন আমার কথা মেনে নিবে।

বাদশাহ তাকে বলল, যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও, তবে তোমাকে তেলে নিক্ষেপ করব না। তাবেয়ী বলল, হে বাদশাহ! আপনি কি মনে করেছেন যে, আমি তেলে নিক্ষেপ হওয়ার ভয়ে কাঁদছি। বাদশাহ বলল, তাহলে তুমি কেন কাঁদছ? তাবেয়ী বলল, আমার একটি বিষয় খেয়ালে এসেছে তাই কাঁদছি। বাদশাহ বলল, তোমার কি খেয়ালে এসেছে? সে উত্তরে বলল, আমার এই বিষয় খেয়ালে এসেছে যে, হে আল্লাহ! আমার জান তো মাত্র একটি। এই লোক একবার আমাকে তেলে ফেলবে। এতে

আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমার আকাঙ্খা আমার শরীরে যে পরিমাণ চুল আছে, যদি আমার জান সে পরিমাণ হতো, তাহলে সে আমাকে এতবার তেলে নিক্ষেপ করতো। আমি এতবার আমার জান আল্লাহর রাহে কোরবান করতে পারতাম। তারা এমন লোক ছিলেন, যারা ঈমানের মূল্য বুঝেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মত আমাদেরকে ঈমানের মূল্যায়ন করার তওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ, গোনাহের কারণে ঈমান থেকে আমাদের মাহরুম করো না। (আমিন) আমরা খুব আশংকাগ্রস্ত , কেননা নবী করিম সা. ইরশাদ ফরমান, মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর রাত্রে ঘুমাতে যাবে ঈমান শূন্য হয়ে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনে রহম করুন। ইসলামের উপর জীবিত রাখুন। এবং ঈমানী মৃত্যু নসীব করুন। আমিন

তৃতীয় শর্ত

আনুগত্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মাগফিরাতের তৃতীয় শর্ত

এটি ২২ পারার সুরা আহযাবের দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াতে কারিমা। এতে আল্লাহ্ দশটি শর্তের উল্লেখ করেছেন, যে কোন পুরুষ-মহিলা এর উপর আমল করবে তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ হতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তা হতে দুটি শর্তের আলোচনা গত হয়েছে। আজ তৃতীয় শর্ত الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী নিয়ে আলোচনা করব।

قنوت এর প্রথম অর্থ আনুগত্য প্রদর্শন।

قنوت শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হল আনুগত্য প্রদর্শন করা, কথা মেনে নেওয়া, হিলা ও হুজ্জতবাজী না করা। সাধারণত আমরা দেখে থাকি, কিছু বাচ্চা আনুগত্যের চিন্তা চেতনার অধিকারী, কোন কাজ করতে

বলা হলে সুন্দরভাবে করে দেয়। আর কিছু বাচ্চার স্বভাবে নাফরমানী, মনগড়া ভাব থাকে, কাজে ফাকি দেয়। আগে বেড়ে তর্ক করে। এই কারণে বলা হয়, অসৎ লোকের গলাবাজীর সীমানা নেই।

দু'প্রকারের মহিলা

মহিলারা দু'প্রকার হয়ে থাকে, কিছু মহিলা খুব আনুগত্য পরায়ন হয়ে থাকে। অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে পিতা, মাতা, বড় ভাই, বড় বোনের আনুগত্য করে। তারা যা বলে সে তাই করে। এ ধরনের বাচ্চাদেরকে সবাই ভালবাসে। তারা বড়ই ভাগ্যবান শিশু। খাবার খাওয়ার মাঝে দশবার উঠতেও তারা বিরক্তবোধ করে না। তারা বোঝে আমি মেয়ে মানুষ। খেদমত আমার পেশা। এটা আমার নির্ধারিত দায়িত্ব। কিছু মেয়ে আছে খুব অলস প্রকৃতির। কাজকর্ম তারা তাদের জন্য মছিবত হয়ে দাঁড়ায়। এসকল মেয়েরা বিবাহিত জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

পুরুষ ঘরের নেতা

আল্লাহ তা'আলা পারিবারিক জীবনে পুরষকে সর্দার বানিয়েছেন। এবং মহিলাকে তার অধিনস্থ পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ পুরুষ নারীদের ওপর কর্তৃতশীল। এটি কোরআনের আয়াত, আমাদের জন্য আল্লাহর পয়গাম। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে মহিলার ব্যবস্থাপক বানিয়েছেন। পারিবারিক জীবনে তার কথাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। কেননা সে ঘরের সর্দার এবং যিম্মাদার। কেয়ামতে পুরা পরিবারের হিসাব তার থেকে নেওয়া হবে। কেননা সে ঘরের আমির। আর আমিরের সাথে আল্লাহর সহযোগিতা থাকে। এ কারণে মহিলাদের বলা হল যে, তারা যেভাবে ঘরে আল্লাহর আনুগত্য করবে সেভাবে স্বামীর আনুগত্যও করবে। দৈনন্দিন কাজ কর্মে স্বামীর কথাকে নিজের জন্য আদেশ মনে করবে। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আনুগত্যের সওয়াব পাবে। স্বামীর আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য। কারণ তার হুকুমেই মহিলা স্বামীর কথা মানে।

কিছু সৌভাগ্যশীলা মহিলা এ বিষয়টি ভাল বুঝতে পারে, এবং দৈনন্দিন জীবনে স্বামী যা বলে তার ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করে। এর উপকারীতা এই হয় যে স্বামী তার প্রতি খুশি থাকে। ঘরে বরকত হয়। স্ত্রী আনুগত্যশীলা হলে, সন্তানরাও আনুগত্যশীল হয়। আর যদি স্ত্রী আনুগত্যশীলা না হয়, সন্তানরাও আনুগত্যশীল হবে না। স্বামী একটি বলবে সে করবে আরেকটি। তার স্বভাবই হল না মানার স্বভাব। অত:পর বহস মোবাহাসার মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, আমি যা করেছি তাই যথার্থ। এ ধরনের বৈবাহিক জীবনে মসিবত নেমে আসে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকে। শয়তানও পূর্ণ ফায়দা গ্রহণ করে নেয়। স্বামীও ক্ষুব্ধ হয় স্ত্রীও ক্ষুব্ধ হয়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে প্রথমে গোপনে গোপনে তর্ক হয়। তারপর উচ্চস্বরে তর্ক হয়। লোকেরা টের পেয়ে যায়। তারপর ঝগড়ায় রুপান্তরিত হয়, প্রতিবেশীরা জেনে যায়, পরিশেষে এর ফলাফল তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

প্রাচির বাকা হওয়া হতে বিরত রাখতে হলে প্রথম ইটটি সোজা রাখতে হবে। প্রথম ইটটি সোজা রাখলে প্রাচির সোজা হবে। এক্ষেত্রে প্রথম ইট সোজা মানে মহিলা অন্তরে এই পরিকল্পনা করবে, যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্বামীর কথা মানার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই আমি তার আনুগত্য করব এবং আল্লাহর কাছ থেকে এর প্রতিদানের আশা করব।

হুজ্জতবাজীর ক্ষতি

এই হুজ্জতবাজী মানুষের অনেক ক্ষতি করে। কিছু মহিলা আছে, যাদের আকৃতি সুন্দর। বোধশক্তিও ভাল আবার শিক্ষিতাও বটে। কিন্তু তাদের মাঝে মানার স্বভাব নেই। বরং তারা মান্যবর হয়ে থাকে। ঘরে বিপদ লাগিয়ে বসে থাকে। নিজেও পেরেশান হয় অন্যকেও পেরেশান করে। তার এই সবচেয়ে বড় পরিণতি হল সন্তান অবাধ্য হয়ে পড়ে। যদি স্ত্রী স্বামীর কথা না মানে, তর্কে জড়ায়, সন্তানরাও তাই শিখবে যা তাদের করতে দেখবে।

প্রথমত এই সকল ঘরের সন্তানরা অবাধ্য হয়, দ্বিতীয়ত ঘর থেকে বরকত চলে যায়। কেননা আমাদের বুযুর্গরা বলেছেন, ঐক্যে বরকত আসে। আর অনৈক্যে বরকত চলে যায়। যেখানে স্ত্রী স্বামীর কথার সাথে একমত হয় না, সেখানে বরকত থাকে না। তারপর পেরেশান হয়ে যায় কি করবে। সময়ে বরকত হয় না, রিযিকে বরকত হয় না। কাজকর্মেও বরকত হয় না। সন্তান-সন্ততির মাঝে বরকত হয় না। বরকত না হওয়ার মূল কারণ হল অনৈক্য। দুজনের একজন তো মানতে হবে। এর একটি শর্ত হল স্বামী স্ত্রীর মুরিদ হয়ে যাবে। স্ত্রী যাই বলবে স্বামী তাই করবে। এটি প্রথমত পুরুষের স্বভাবের বিপরিত, দ্বিতীয়ত আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্সিক। এই কারণে এই মহিলা অন্তরে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে যে ঘরে স্বামীর কথা মেনে চলবে, মেয়ে পিতার কথামত চলবে। বড়কে মেনে চলবে।

আজ অবস্থা এমন হয়েছে যে, পুত্র মার কথা মানতে চায় না বরং মাকে পুত্রের কথা মানতে হয়। মার সাথে জিদ করে। মেয়ে মার উপর ভিতির সঞ্চার করে। বড় কমবখত মেয়ে। যে মেয়ে মায়ের অনুগত্য করে সে বড়ই ভাগ্যবতি কন্যা, আল্লাহর আনুগত্যশীলা বান্দি, আল্লাহর কাছে জান্নাতের উপযুক্ত হবে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

মেয়েদের উচিত হল বড়দের কথা মানা। এর ফলাফল কি হবে? যেমন কর্ম তেমন ফল। আজ যদি সে বড়কে মানে কাল যখন সে বড় হবে, মা হবে তার ছোটরা তাকে মানবে। তার সন্তানরা সকলে তাকে মেনে চলবে। এসকল মহিলাদের সন্তানরা আনুগত্যশীল হয়। যারা পিতা-মাতা ও স্বামীর আনুগত্যশীলা হয়। এটি আদান-প্রদান। যেমন কর্ম তেমন ফল। যারা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তাদের সন্তানরা কিছুতেই তাদের বাধ্য হয় না। তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়, বার্ধক্য কালে তাদেরকে কাঁদায়, কষ্ট দেয়। ইসলামের সৌন্দর্য হল যেখানেই শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছে, সে সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং ঘর থেকে শয়তানের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উত্তম পদ্ধতি হল, স্ত্রী অন্তরে এ ফায়সালা করে নিবে

যে, আমাকে স্বামীর কথা মানতে হবে। বড়দের কথা মানতে হবে। চাই সে শশুর কিংবা শাশুড়ী হোক বা আমার মা কিংবা বাবা হোক, বা আমার বড় ভাই-বড় বোন হোক। আমি বড়দের মেনে চলব। ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা ছোটদেরকে আমার আনুগত্যশীল বানিয়ে দিবেন। এটি তো জীবনে বড় সৌভাগ্য। আজ যে মেয়ে ছোট সেই আগামীতে বড় হবে। স্বামীর কথা মেনে নিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। প্রতিদান হিসেবে তাকে বাধ্য সন্তান দান করবেন, যাদের দেখে তার চোখ জুড়াবে।

শয়তানের রাস্তা

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের আদেশ প্রদান করলেন أسجدوالآدم তোমরা আদমকে সেজদা কর। সকল ফেরেশতা একথা মেনে নিল الا ابليس তবে ইবলিশ মেনে নিল না। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কেন তাকে সিজদা করলে না? সে আগে বেড়ে গলাবাজি করে বলল, أنا خير منه আমি তার থেকে উত্তম। ফলাফল কি দাঁড়াল? আল্লাহ তা'আলা বললেন, فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, তুই বিতাড়িত।

সুতরাং যে সকল মহিলারা শয়তানের পথ অবলম্বন করে স্বামীর কথা মানার পরিবর্তে তার সাথে হীলা বাহানা ও হুজ্জতবাজী করে, শয়তানের পথ অবলম্বনের ফলাফল এ দাঁড়ায় যে তাকে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

হযরত আদম আ : এর তরীকা

আরেকটি তরীকা হল হযরত আদম আ. এর তরীকা হল ভুলের পর ক্ষমা। তাঁর থেকে ও ভুল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এই বৃক্ষের ফল খেতে বারণ করেছেন। কিন্তু তিনি তারপরও খেয়েছেন, খাওয়ার সাথে সাথেই তার মাঝে ভুলের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে যে, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে এবং তিনি বলতে লাগলেন-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থঃ তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

এটি হযরত আদম আ. এর পদ্ধতি, ভুল স্বীকার করে নেওয়া। ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার সাথে পূর্বের প্রতিশ্রুতি বহাল রাখলেন। সুতরাং ভুল হয়েছে ক্ষমা করুন।

এটি উত্তম শব্দ। যদি মহিলারা অধিক হারে এবাক্য ব্যবহার করে, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। যদি এমন কোন কাজ প্রকাশ পায় যাতে অলসতা ও কমতি থাকে এবং স্বামী বলে তুমি এমন করলে কেন? তাহলে এর উত্তরে মিথ্যা বলা, বাহানা করা, স্বামীর দৃষ্টিতে সত্যবাদী হওয়ার চাইতে এ কথা বলে দেওয়া অধিক উত্তম হবে যে, আমার ভুল হয়ে গেছে ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে চলব। আমাকে ক্ষমা করুন। এর দ্বারা স্বামী ও খুশি হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলাও খুশি হয়ে যান।

অবাধ্যতা একটি রোগ

আপনারা দেখে থাকবেন যে বকরী একটি প্রাণী, কিন্ত মালিকের এতই অফাদার, যদি সে ঘাস খাওয়া অবস্থায়ও মালিক তাকে ডাকে সে ঘাস ছেড়ে মালিকের পিছনে চলে আসে। তো যার মাঝে আকল নেই, কিন্তু সে তার মালিকের কতইনা অফাদার! আর মহিলাকে আল্লাহ্ তা'আলা আকল দান করেছেন। সে তার আকল ব্যবহার করে সর্বদা স্বামীর কথামত চলবে। এতে সর্বদা তাদের মাঝে বরকত হবে। যদি সে স্বামীর কথা পুঙখানুভাবে বাস্তবায়ন করে, তবে সে আল্লাহর কথাও মানবে। পক্ষান্তরে যারা স্বামীর কথা মানে না, দেখা যায় যে, তারা আল্লাহর কথা ও মানে না। শরীয়তের বিষয়াদী নিয়ে হটকারিতায় লিপ্ত হয়। তারা এই বুঝে নেয় যে মাওলানা সাহেব নিজের থেকে মাসআলা বানাচ্ছেন। তারপর শরীয়তের উপর আপত্তি করতে শুরু করে। তারপর যশ খ্যাতির কাজসমূহ বড় আগ্রহের সাথে করে। নেককাজ করা তাদের জন্য মসীবত হয়ে দাঁড়ায়।

আনুগত্যের পুরস্কার

যে মহিলা এই সংকল্প করে নিবে যে, আমি আজ থেকে স্বামীর কথা মানব। তবে সে বড়দের কথা ও মানবে। এটি একটি নিয়ামত যা আল্লাহ্ তা'আলা কারো কারো হৃদয়ে দান করেন। কিছু কিছু মহিলা এতই নম্র ও ভদ্র হয়ে থাকে যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের হুরদের আখলাক দিয়েছেন। প্রতিটি কাজ স্বামীর সাথে পরামর্শ করে বাস্তবায়ন করে। সকল কাজ স্বামীকে জিজ্ঞেস করে বাস্তবায়ন করে। ঘরকে জান্নাতের নমুনা বানিয়ে দেয়।

এই কারণে হাদীসে এসছে যে মহিলা ফরযসমূহ্ পূর্ণ করে এবং স্বামীর তার উপর খুশি তাকে তাহলে তার মৃত্যুর সাথে সাথেই আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন। পুরুষকে জান্নাত পেতে হলে অনেক চেষ্টা মোজাহাদা করতে হয়। কখনো দ্বীনের রাস্তায় বের হতে হয়, কখনো কষ্ট সহ্য করতে হয়। কখনো কোরবানী করতে হয়। রাতে তাহাজ্জুদের জাগ্রত হতে হয়। পুরুষরা ভীষণ কষ্ট ও মোজাহাদার পর জান্নাত লাভ করে। আর মহিলাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা খেদমতের কারণে জান্নাত দিয়ে দিবেন। যে শুধু স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবে।

মোটা মোটা ফরজসমূহ আদায় করবে তবেই তারা সোজা জান্নাতে চলে যাবে। মহিলাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এতই ছাড় দিয়েছেন যে, যে মহিলা স্বামীকে খুশি রাখবে, শরীয়তের আহকাম, যথা সময় রোজা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দার মত মোটা মোটা বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করবে, কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকবে। সোজা জান্নাতে চলে যাবে। কিতাবে লেখা আছে, যে মহিলা স্বামীর বাধ্য হয়, যখন সে জান্নাতে যাবে, জান্নাতের দরজায় একটি সওয়ারী তার অপেক্ষায় থাকবে, সে পালকিতে চড়ে স্বীয় বাসস্থানে চলে যাবে।

আনুগত্যের অঙ্গীকার : আমার এই আলোচনা কিছু কিছু মহিলা অন্তরে মেনে নিচ্ছে। কারো কারো অন্তরে রাগ আসছে, যে মাওলানা সাহেব আজ কি লেকচার দেওয়া আরম্ভ করেছেন।

আপনার রাগ আসলেও আপনি চিন্তা করুন সত্য কথা তো সত্যই হয়ে থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য এই নয়, যে, সব বিষয়ে স্বামী হিটলার বনে যাবে। স্ত্রীর সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করবে না। স্বামীকে ও একথা বুঝতে হবে আল্লাহ তা'আলা মহিলাকে পরামর্শদাতা বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ তারা তাদের ঘরের কাজ পরস্পর পরামর্শ সাপেক্ষে করে থাকে। যদি স্বামী তার ডিউটি পালন করে, স্ত্রী তার ডিউটি পালন করে, তাহলে স্বামীও জান্নাতে যাবে, স্ত্রীও জান্নাতে যাবে। কিন্তু এটি কোনো অজুহাতের বিষয় নয়, যে স্বামী আমার কথা শুনে না আমি কেন তার কথা শুনতে যাব? এর উদ্দেশ্য তো এই দাঁড়াবে যে কেউ খারাপ করল, আমি খারাপ করে দেখিয়ে দিলাম। কেউ জাহান্নামে যাচ্ছে আমিও কি তার সাথে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য লাফ দিয়ে দেখিয়ে দিব। এটি কেমন বিষয় হবে?

মহিলাদের উচিত হল, যে তার যিম্মাদারী পূর্ণ করবে। এরদ্বারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। আল্লাহর কাছে সে আশ্রয় পাবে। ঘরে বরকত হবে। আনন্দ ও শান্তি বহাল থাকবে। আজকের মজলিসে আমি চাচ্ছি, যে মহিলারা এই অঙ্গীকার করে নিবে যে, কোরআনের আয়াতকে সামনে রেখে আমরা আমাদের জীবনের বিন্যাস পরিবর্তন করে ফেলব। যদিও পিছনের জীবনে স্বামীর সাথে তর্ক ঝগড়া বাহানা করতাম, আজ থেকে স্বামীর কথা স্বাচ্ছন্দে মেনে নিয়ে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যাব।

কুনূত শব্দের দ্বিতীয় অর্থ ইখলাস

মুফাসসীরিনে কেরাম কুনূত শব্দের দ্বিতীয় অর্থ 'ইখলাস' লিখেছেন। অর্থাৎ ইখলাসের সাথে আমলকারী মহিলাগণ। যদি কুনূত শব্দের অর্থ 'ইখলাস' নেওয়া হয়, তবে তার উদ্দেশ্য হবে, এমন মহিলা যারা লৌকিকতা তথা লোক দেখানোর জন্য আমল করে না।

লোক দেখানোর বিপদ

লোক দেখানোও একটি বড় বিপদ। পুরুষের মাঝেও অনেকের হয়ে থাকে। মহিলাদের মাঝে তো পরিপূর্ণরুপে হয়ে থাকে। তাদের মাঝে লোক

দেখানোর এমন পদ্ধতি এসে থাকে, যা পুরুষের কল্পনায় ও আসে না। প্রত্যেক কাজে তারা লোক দেখায়। তাদের যেহেনে একথা থাকে যে মানুষ কি বলবে? তারা জুতা কিনলেও লোক দেখানোর জন্য কিনে। কাপড়ও লোক দেখানোর জন্য কিনে। স্বর্ণ অলংকারও লোক দেখানোর জন্য কিনে। খুব কম মহিলাই স্বামীকে খুশী করার জন্য জিনিসপত্র ক্রয় করে। সাধারণত অন্য মহিলাকে দেখানোর আগ্রহ থাকে। স্বভাব এমন হয়ে গেছে, যে অন্য মহিলা দেখে বলুক, যে বাস্তবেই তার পছন্দ অনেক ভালো। এই কারণে কসমেটিক কেনার জন্য ব্রেন্ডের মালের কাছে যায়। যাতে করে ঘরের বস্তু দেখে বলে, যে সে ব্রেন্ডের মাল ব্যবহার করে। বিবাহ-শাদীতে অধিকাংশ কুপ্রথা মহিলাদেরকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। লোক দেখানোর জন্য এত অধিক পরিমাণ টাকা অপচয় করা হয়, যে মহিলা চিন্তাই করে না যে এটি স্বামীর সাধ্যে আছে কি নাই। এর পিছনে একটিই lagre (দলীল) লোক কি বলবে? অথচ মানুষ সবকিছু দেখার পরও কোন না কোন দোষ বের করে।

মানুষ ও খুশি হয় না

মানুষকে কিছুতেই খুশি করা যায় না। হযরত রুমী রহ. একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। একবার পিতা-পুত্র কোথাও যাচ্ছিল। সাথে ছিল একটি গাধা। তারা উভয়ে গাধায় চড়ে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর এক লোক বলল, দেখ গাধা একটি, তাতে আরোহন করেছে দুইজন। বোবা প্রাণীটির প্রতি তাদের খেয়াল নাই। একথা শুনে পিতা পুত্রকে নামিয়ে দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন বলতে লাগল, দেখুন, লোকটি বড়ই স্বার্থপর। নিজে গাধায় চড়ে যাচ্ছে, আর ছোট্ট ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে পিতা নেমে পুত্রকে গাধায় বসিয়ে দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর কেউ বলল, ছেলেটি বড় বেয়াদব, বাবা হাঁটছে আর নিজে গাধায় চড়ে যাচ্ছে। এখন দুজনেই হাঁটা শুরু করে দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর কেউ বলতে লাগল, এই লোকদের সামান্য আকলও নেই, গাধা রেখে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মাওলানা রুমী রহ. বলেন, তাদের একটি পদ্ধতি বাকী রয়ে গেছে। সেটি হল উভয়ে মিলে গাধাটিকে মাথায় তুলে নিবে। কিন্তু এতেও মানুষ খুশী হবে না, বরং বলবে এত নির্বোধ মানুষ তো আর দেখেনি, যারা গাধাকে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই সকল মাখলুককে খুশী করা সম্ভব নয়। তাই একটিই পদ্ধতি, সেটা হলো আল্লাহকে খুশী করবে, বড়কে ও স্বামীকে খুশী রাখবে। সব কাজ সুন্নত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করবে। সুন্নত মুতাবেক জীবন পরিচালনায় আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে তার সম্মান সৃষ্টি করে দেন এবং তার একটি ভাল ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়।

লোক দেখানো আমলের প্রতিদান থাকে না

বিবাহ শাদীতে মহিলারা উত্তম পোষাক পরিধান করে পরিপাটি হয়ে সেজে গুজে বিবাহের অনুষ্ঠানে আসে। বিবাহের অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ বেপর্দা হয় তা অন্য কোথাও হয় না। কখনো কখনো মহিলারা নেকাব পরে আসে। কিন্তু তা পর্দার কারণে নয় বরং সে পরিপাটি হয়ে আসতে পারেনি, তাই চিন্তা করে গোমরা চেহারা নিয়ে কিভাবে জনসম্মুখে যাব। তাই নেকাব পরে আসে। অনুরুপভাবে ঘরে নিকটাত্মীয় আসলে ও লম্বা পোশাক খোলে না। ইহা পর্দার কারণে নয় বরং কাপড় ময়লা থাকায় লম্বা পোশাক ঝুলিয়ে দিয়ে দিয়েছে। লোক দেখানো বড় মসীবত। বান্দা প্রত্যেকটি কাজ লোক দেখানোর জন্য করে। এভাবে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে যায়।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা এক আলেমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি দুনিয়ার কি কি করেছো? সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি মাদ্রাসা বানিয়েছি, মসজিদ নির্মাণ করেছি, সারা জীবন দ্বীনের খেদমত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, না তুমি এ কারণে ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়। فقد قيل আর তা তোমাকে বলা হয়ে গেছে। আজ আমার কাছে এর কোন প্রতিদান নেই। ফেরেশতাকে বলা হবে, তাকে উল্টো করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। হাদীসে এসেছে, তারপর আল্লাহ তা'আলা শহীদকে ডেকে বলবেন, তুমি

দুনিয়াতে আমার জন্য কি করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্য আমার জীবন কোরবান করে দিয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, না, বরং তুমি জিহাদ করেছো যাতে তোমাকে বাহাদুর বলা হয়, আর তা বলা হয়ে গেছে। আজ আমার কাছে তোমার কোন প্রতিদান নেই। তাকে উল্টো করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাদীস পড়লে শরীর কেঁপে উঠে। হায় আল্লাহ, যে, জান দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু লোক দেখানোর কারণে রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের মত দুর্বলদের কি অবস্থা হবে?

মূল কাজ ও প্রতিকার

এই জন্য আসল কাজ হল, আমলকে রিয়া মুক্ত করা। হযরত ইকরীমা রা: বর্ণনা করেন, রিয়া নিয়তে প্রবেশ করে। রিয়াকার আল্লাহর সাথে সাথে ঠাট্টা করে। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ: বলেন, এক লোককে কাবার গিলাফ জড়িয়ে দোয়া করতে দেখলাম, এবং খোরাসানের লোকদের দেখিয়ে দোয়া করছে। লোকজন প্রশ্ন করল, হযরত এটি কি করে সম্ভব? সে মক্কায় দোয়া করছে আর লোকজন রয়েছে খোরাসানে। আর আপনি বলছেন যে, সে খোরাসানের লোকদের দেখাচ্ছে। এর কি মতলব?

জবাবে তিনি বললেন, গিলাফ ধরে সে যদিও মক্কায় দোয়া করছে, কিন্তু তার অন্তরে এই খিয়াল এসেছে, যে যদি আমার দেশের লোকজন দেখতে পেত, আমি কিভাবে বিনয়ের সাথে দোয়া করছি। কাবার গিলাফ ধরার পরও এই ধারণা চলছে। এই ধরনের দোয়া বান্দার মুখে নিক্ষেপ করা হবে। এই জন্য নামাজ পড়, পর্দা কর, নেক কাজ কর অন্তরে এই কথার চিন্তাও করবে না যে, কেউ আমাকে দেখছে। আমার প্রশংসা করছে। এই চিন্তা যেহেন থেকে একেবারে বের করতে হবে।

মুখলীস বান্দা কে?

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ.-কে বলা হল হযরত আমরা 'ইখলাস' শব্দটি পড়ে থাকি। কিন্তু আপনি একটি মেসালের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন, মুখলীস (একনিষ্ঠ) বান্দা কে?

উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা কি বকরির রাখালকে দেখেছ? তারা বলল, অবশ্যই দেখেছি। তিনি বললেন নামাজের সময় সে বকরিদের মাঝে মুসল্লা বিছিয়ে নামাজ পড়ার সময় তার কি এ ধারণা থাকে যে বকরিগুলো আমাকে দেখছে? আমার প্রশংসা করবে? তারা বলল, কখনো নয়। রাখাল বকরির মাঝে নামাজ পড়লে যেমন তার অন্তরে কোন কল্পনা জাগে না, অনুরুপভাবে মুখলীস বান্দা মানুষের মাঝে বসে নামাজ পড়ার সময় তার অন্তরে কোন প্রকারের প্রশংসার বাসনা আসে না, যে মানুষ আমাকে দেখছে, বরং তার দৃষ্টি থাকে এক আল্লাহর প্রতি।

একটি আশ্চর্য বিষয়

আল্লাহর শান দেখুন! রিয়াকারের তুলনায় মুখলীস বান্দার সুনাম সুখ্যাতি বেশি হয়ে থাকে। লোক দেখানোর জন্য আমলকারী লোক এই কারণে লোক দেখিয়ে আমল করে যাতে মানুষ তার প্রশংসা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রশংসা করে না। আর যে গোপনে ইবাদত করে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে তার প্রশংসা চালু করে দেন। ইখলাসের পথে অধিক পরিমাণে প্রশংসা ও লাভ হয়ে যায়।

রিয়াকারের দৃষ্টান্ত হল, ঐ ব্যক্তির মত যে পাথরের টুকরা দ্বারা পকেট ভরল। মানুষ পকেট দেখে বলতে লাগল তার কাছে টাকার অভাব নেই। কিন্তু যখন টাকা বের করার সময় হবে তখন টাকার পরিবর্তে পাথর বের হবে। অনুরুপভাবে রিয়াকারীকেও মানুষ নেককার মনে করে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তার ইবাদত, মোজাহাদা ও মেহনত কোন কাজে আসবে না। যদি কিয়ামতের দিন কোন প্রতিদান না পাওয়া যায় তবে এই দৌড়-ঝাপ কোন কাজে আসবে না।

খালেস দ্বীনই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহঃ একবার সুরা ত্ব-হা পাঠ করছিলেন। তার পাশ দিয়ে তার এক বন্ধু যাচ্ছিল। তখন তার অন্তরে এই কথা আসল যে, আমার বন্ধু আমার তেলাওয়াত শোনছে। রাত্রে ঘুমালে স্বপ্নে তার

আমলনামা দেখতে পেলেন। এবং ইহাও দেখলেন যে, সুরা ত্বহার হরফসমূহ স্বর্নাক্ষারে লিখা আছে। তিনি খুব খুশি হলেন যে আল্লাহ তা'আলা আমার তেলাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন। খুশিতে আমলনামার পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলে কিছু আয়াতে জায়গা খালি পড়ে আছে। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন, যে এই জায়গা কেন খালি পড়ে আছে। সামান্য চিন্তা করার পর বুঝতে পারলেন, যে এটি ঐ দুই আয়াত যা আমি আমার বন্ধুর নিয়তে পড়েছি। তাই আল্লাহ তা'আলা এই দুই আয়াতের প্রতিদান থেকে আমাকে মাহরুম করেছেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা খুব মজবুত কথা বলেছেন (الزمر :) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ অবিমিশ্রিত আমল আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। যদি নিরানব্বই ভাগ আমল আল্লাহর জন্য করা হয়, আর একভাগ লোক দেখানোর জন্য তারপরও আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না।

এই ধরনের আমল বান্দার মুখে মারা হবে। শতভাগ আমল ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য করা চাই। লোক দেখানোর ভাইরাস ভিতরে প্রবেশ করলে এই আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। লোক দেখানো ভাইরাস যদি আমলে ঢুকে যায়, তবে আল্লাহর দরবার থেকে এই আমল ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের আকাবিররা নেক আমলকে এমনভাবে লোকাতেন যেমনভাবে মানুষ গোনাহকে লোকায়। পক্ষান্তরে আমরা এই ক্ষেত্রে খুব দক্ষ যে বাম হাত গোনাহ করলে ডান হাতও টের পায় না। কিন্তু নেকীর কাজ করলে আর একথা মনে থাকে না। (বরং প্রকাশ করে দেয়)।

আমার সম্মানিত মায়ের ভাল কাজ লোকানোর অভ্যাস

আল্লাহ তা'আলা কিছু মহিলাকে নেক আজ গোপনে করার বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা দ্বারা মানুষ হয়রান হয়ে পড়ে। অধমের সম্মানিত মায়ের একটি ঘটনা এই মুহূর্তে যেহেনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। মহল্লার অসংখ্য মহিলাদের জন্য তিনি কল্যাণকামী ছিলেন। যা আমাদের ঘরের মহিলারাও জানত না। আমার বড় বোন ঘটনাটি শুনিয়েছেন। আমাদের মহল্লার এক মহিলাকে স্বামী ঠিকমত খরচা

দিত না। স্বামীর সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল না। সে সন্তানদের নিয়ে বড় পেরেশানীতে ছিল।

একবার আমার আম্মাজানের কাছে দু'আ নেওয়ার জন্য আসল। আম্মাজান তাকে সহযোগিতা করা শুরু করলেন। সে কয়েকদিন পরে আসলে কিছু না কিছু দিতেন। এবং অল্প সময়ে তাকে ফারেগ করে দিতেন। কিছুদিন পর সে অন্য মহল্লায় চলে গেল। আম্মাজান ছিলেন বৃদ্ধা। অনেকদিন খোঁজ-খবর নিয়েও তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েকবার তার আলোচনা করলেন। সম্মানিতা সহদোরা বলেন, একবার শহরে গেলে ঐ মহিলার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কোথায় থাকেন? সে বলল, আমি পাশের মহল্লায় চলে গেছি। আমি এত ব্যস্ত হয়ে গেছি যে আপনাদের কাছে যাওয়ার সময় পাই না। আমার বোন এসে মাকে এই সংবাদ দিল। তিনি তাকে ঐ মহিলার কাছে নিয়ে যেতে বললেন। আম্মাজান যেহেতু বৃদ্ধা ও অসুস্থ ছিলেন তাই তাকে বললেন, কিছু বলতে বা দিতে হলে আমাদের বলুন।

আম্মাজান বললেন, না আমি তার কাছে যাব। বোন তাকে নিয়ে চললেন। অসুস্থতার কারণে রাস্তায় কিছুক্ষণ চলতেন, আবার বসতেন। আমার বোন বলেন, আমরা ঐ মহিলার কাছে গেলাম। আম্মাজান কখন তাকে কি দিয়েছেন, আমার খবরই ছিল না। তারপর আমরা ফিরে আসলাম। আম্মাজানের মৃত্যুর পর ঐ মহিলা এসে আমাকে বলল, যে, আপনাদের মা আমাকে ঐ দিন দশ হাজার রুপি দিয়েছিলেন।

একবার মহল্লার একটি যুবতি মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। স্বামী চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিল না। সে আম্মাজানের কাছে আসত। আম্মাজান তার জন্য দোয়া করতেন এবং কিছু সহযোগিতা করতেন। কয়েকদিন যাবৎ সে আসল না। একদিন তার বড় বোন আসল। আম্মাজান তাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, যে এই টাকাগুলো তোমার বোনকে দিয়ে দিও। তোমার বোনের এই টাকা আমার কাছে ছিল আমার কাছে টাকা না থাকায় দিতে বিলম্ব হয়ে গেছে। বড় বোন টাকাগুলো নিয়ে ছোট

অসুস্থ বোনকে বলল, অমুক মহিলার জিম্মায় তোমার এই টাকাগুলো ছিল, তার কাছে টাকা না থাকায় এতদিন পরিশোধ করতে পারেনি। আজ আমার মাধ্যমে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সে আশ্চর্য হয়ে চুপ থাকল। কিছুদিন পর আম্মাজানের কাছে এসে সে বলতে লাগল, আম্মাজান! আপনি আমাকে এই টাকাগুলো কেন দিলেন? তখন আম্মাজান বললেন, বেটি! তোমার সহযোগিতার জন্য দিয়েছি। কিন্তু তোমার বোনের কাছে সহযোগিতার কথা বললে সে তোমাকে তিরস্কার করতো, তাই আমি তার কাছে এমন ভাব প্রকাশ করেছি যে, আমার উপর ঋণ ছিল। তাই তুমি টাকাও পেয়ে গেছ। তোমার উপর বোনের আপত্তি ও আসল না, এবং আমার আমলও গোপন থাকল।

নেকি লোকানো উচিত

তামান্না থাকবে যে সকল পুরুষ-মহিলা নেক কাজ এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে, যাতে করে কাছের লোকেরা জানতে না পারে। এই খোশ নসীব যাদের হবে কিয়ামতের দিন তাদের মাথায় মুকুট পরানো হবে। আমাদের আসলাফদের (পূর্বসূরীদের) মাঝে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যেত। অনেক লোক এমন ছিল যারা রাতের অন্ধকারে মানুষের ঘরের দরজায় কোন বস্তু রেখে চলে আসতো এবং চিরকুট লিখে দিতো যে, এইগুলো হাদিয়া। জানাও যেত না ইহা কার পক্ষ থেকে হাদিয়া এসেছে। হযরত আয়শা রাযি. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, কোন ফকিরকে কিছু দেওয়ার পর তিনি পিছন থেকে শুনতেন যে, তার জন্য কি দোয়া করছে? ফকির যে দোয়া করতেন তিনিও তার জন্য সেই দোয়া করতেন এবং বলতেন যে, তোমার কাছে আমার কোন আশা নেই, আমার আশা কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছে। কিন্তু আজ আমরা কারো সাথে ভালো আচরণ করি। এই জন্য যাতে করে মাহফিলে আমার প্রশংসা করা হয়। আমল নষ্ট করে ফেলা কতই না আফসোসের বিষয়! আমাদের আকাবিদের আশ্চর্য এক ঘটনা কিতাবে লিখেছেন।

এক বুযুর্গ ছিলেন। নাম আবু উমর নুজাইর রহ.। তাকওয়া ও মাল উভয়টাই তাকে দেওয়া হয়েছিল। একবার তখনকার বাদশাহ ধনাঢ্য লোকদের জমা করে বলল, আমরা সাধারণ লোকদের সাহায্যের জন্য ফসল উত্তোলনের কাজ করতে চাই। আবু উমর নুজাইর রহ. দু' লাখ দিনার দিয়ে দিল। দ্বিতীয়বার মিটিং হলে বাদশাহ মজলিসে সকলের সামনে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিষয়টি প্রকাশ করে দিল। তোমরা দেখ! আবু উমর নুজাইর দু' লাখ দীনার দান করেছেন। একথা শুনামাত্র সে দাঁড়িয়ে বলল, জাহাপনা! আমি আপনার কাছে যে টাকা দান করেছি, সে ব্যাপারে কারো সাথে আমার পরামর্শ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি পরামর্শ করি নি। তাই টাকা ফেরত দিয়ে দিন। বাদশাহ দীনারের থলি ফেরত দিয়ে দিল। মজলিসের সবাই বলতে লাগল, কত খারাপ লোক! সে টাকা দিয়ে আবার ফেরত নিয়ে গেছে। মজলিস খতম হলে চুপিসারে বাদশাহকে দু' লাখ দীনার দিয়ে বলল, বাদশাহ! আপনি লোকদের সামনে প্রকাশ করার দ্বারা আমার আমল নষ্ট করে দিয়েছিলেন। আমি ফেরত নিয়ে মানুষের অপমানের শিকারতো হয়েছি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আবার দিয়ে দিচ্ছি। আপনি বিষয়টি কাউকে বলবেন না। আল্লাহু আকবার কাবীর।

আমলের কোয়ালিটি যাচাই

বর্তমানে দুনিয়াতে কোয়ালিটি যাচাইয়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে কোয়ালিটির কথা আছে। আল্লাহর তা'আলার কাছেও প্রত্যেক আমলের কোয়ালিটি খুলে খুলে যাচাই করা হবে। শত ভাগ ইখলাসের সাথে যে আমল করা হয়েছে তা কবুল করা হবে। আর ইখলাসের ঘাটতি হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আমরা সামান্য বস্তু ক্রয় করার ক্ষেত্রেও কোয়ালিটি যাচাই করি। তাহলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কি আমলসমূহের কোয়ালিটি যাচাই করবেন না? এ বিষয়টি যেহেনে রাখতে হবে যে মানুষের প্রশংসাই হল প্রতিদান। আমাদের যেহেনে যদি এই খাহেশ জন্মে যে, মানুষ প্রশংসা করুক আর মানুষ প্রশংসা করে দেয়,

তাহলে যেন আমলের প্রতিদান হাসিল হয়ে গেছে। অফিসসমূহে ভাউচার প্রস্তুত করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে বিল পরিশোধ করা হয়। অফিসে চাকুরী কালীন সময়ের একটি ঘটনা। এক ইঞ্জিনিয়ার ছিল তার টাকার অনেক প্রয়োজন ছিল। ক্যাশীয়ার তাকে ফোনে জানাল যে, আমার কাছে একটি ভাউচার আছে। সেই মোতাবেক আপনি আমার কাছে পনের হাজার রুপী পাবেন। এসে নিয়ে যান। সে খুশীতে জলদী গেল। কিছুক্ষণ পর চোখে পানি নিয়ে ফিরে আসল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! কি হয়েছে? সে বলতে লাগল, ভাউচার তো বাস্তবেই তার কাছে আছে, কিন্তু বের করার পর দেখা গেল যে উক্ত টাকা পরিশোধ হয়ে গেছে। এবং সীলমারা আছে। অনুরুপভাবে কিয়ামত দিবসেও আমলনামা বের করা হলে তাতে পরিশোধের সীল মারা থাকবে। কিয়ামতের দিনও তার হাত খালি হয়ে যাবে। এত কষ্ট কি একারণে করা হয়েছিল যে, দুনিয়াতে কিছু লোক বলবে, সে অনেক ভালো মানুষ। আর ইহাই প্রতিদান হয়ে গেল দুনিয়াতে।

একারণে শত ভাগ নিয়ত আল্লাহর জন্য করা চাই। যে হে আল্লাহ! আপনার কাছেই এর প্রতিদান চাই। হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী নবী কারীম সা. কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর নবী! আমরা আল্লাহর জন্যই আমল করি, কিন্তু মানুষ ও প্রশংসা করে থাকে। নবী কারীম সা. বললেন, ইহা আখেরাতের সওয়াবের একটি অংশ যা আল্লাহ বান্দাকে দুনিয়াতে প্রদান করেন। তাই প্রশংসা তো আল্লাহ তা'আলা মানুষের যবান দিয়ে করিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের নিয়ত হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সারকথা

আজকের মজলিসের সারকথা হল قنوت শব্দের যদি অর্থ হয় মানা, আমরা অন্তরে এই নিয়ত করে নিব যে আজকের পর থেকে স্বামী ও বড়দের সকল বিষয় মেনে চলব। এর প্রতিদান অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা এমন সম্মান দিবেন, যে হতে পারে স্বামী আপনার কথা মানতে থাকবে। আমরা দেখেছি যে নেককার স্ত্রী তার নেকির কারণে স্বামীর নিকট এমন অবস্থান তৈরী করে নেন তাদের যবান

থেকে যা বের হয়, স্বামী তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। আর যদি কুনুত এর অর্থ হয় ইখলাস দ্বারা তবে আজ থেকে আমরা সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করব। মানুষকে দেখানোর কোন চিন্তু যেহেনে আনব না, আর যদি চিন্তা এসেও যায়, তবে ইসতিগফার পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ত পরিশুদ্ধ করে নেব।

বারবার নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিব, পরিশেষে বান্দা ইখলাসের সাথে আমল করতে থাকবে। আর কুনূত এর সাধারণ অর্থ হল আনুগত্য। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পন্থা হল, শরীয়তের গন্ডির ভিতর থেকে আমরা আমাদের বড়দের আনুগত্য করা। কারণ শরীয়তের হুকুম হল لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق আল্লাহর নাফরমানী করে মাখলুকের কোন প্রকারের আনুগত্য করা যাবে না।

ঘরের কাজকর্মে শত ভাগ স্বামীর কথা মেনে চলা স্ত্রীর জন্য ইহা নেকীর কারণ হবে। ঘরের কাজ ও আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্ট হাসিল হয়ে যাবে। ইহা কতই না উত্তম বিষয়, আর যে মহিলা গলাবাজীর অভ্যাস রয়েছে, তার জন্য ইহা থেকে তওবা করা উচিত। এরদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। আর একথা থেকে স্পষ্ট যে এরদ্বারা স্বামীও অসন্তুষ্ট হয়।

হযরত নূহ্ আঃ-এর আনুগত্য

কোরআন মাজীদের একটি উপমায় চিন্তা করুন। মনোযোগ দিয়ে অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। হযরত নূহ্ আ.-এর প্লাবনের সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে আপনার পরিবারকে আমি বাঁচিয়ে দিব। তাই যখন প্লাবন আসল হযরত নূহ্ আ. তার উপর ঈমান আনয়নকারী সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহন করেন। তার একপুত্র নৌকায় উঠেনি, হযরত নূহ্ আ. তাকে বললেন, يَٰبُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا হে বৎস! আমাদের সাথে নৌকায় চলে আস। কিন্তু সে আগে বেড়ে একটি বাহানা দাঁড় করাল যে আমি পাহাড়ে উঠে যাব, আর বলতে লাগল। قَالَ سَاٰوِيٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ

আমি পাহাড়ে আশ্রয় নিব পাহাড় আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। ফলাফল দাঁড়াল, وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ একটি ঢেউ আসল, পুত্র পিতার চোখের সামনে ডুবে মারা গেল। সন্তানের প্রতি পিতার কতই না ভালোবাসা থাকে? সন্তানের ডুবার সময় হযরত নূহ আ. আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ হে আল্লাহ! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অর্ন্তভুক্ত, আপনার ওয়াদা বাস্তব। আপনি তো মহাবিচারক। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হল, قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ۖ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তার কর্ম ভালো নয়, সুতরাং যে বিষয়ে আপনার ইলম নেই সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যাতে আপনি জাহেলেদের মাঝে গণ্য না হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে ফরমান আমার সাথে কোন হুজ্জতবাজী না করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ হযরত নূহ আ. বললেন, হে আমার রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে যার ইলম আমার নেই। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, এবং অনুগ্রহ না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব। ইহাকেই বলে আনুগত্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন আনুগত্যের উপর কবুল করুন। আমীন

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

চতুর্থ শর্ত

সাদাকাত/সততা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

মাগফিরাতের চতুর্থ শর্ত

সূরা আহযাবের এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দশটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। যদি পুরুষ-মহিলা তা পূর্ণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। তন্মধ্যে থেকে চতুর্থ শর্ত হল,

والصادقين والصادقات

সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী।

সিদক এর শাব্দিক অর্থ হল মূল, বাস্তবতা। ইসলাম সত্য বলার শিক্ষা প্রদান করেছে। নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান-

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

আমি উত্তম আখলাককে পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

সত্যবাদী লোক কারা

সত্যবাদী লোক কারা, আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ নিঃসন্দেহে ঈমানদার তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর ওপর ঈমান এনেছে এবং সন্দেহেও পতিত হয় নি। এবং নিজের জান মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তারাই সত্যবাদী। আয়াতের উদ্দেশ্য হল যারা কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়া ঈমান আনে, এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল খরচ করে জিহাদ করে, তারা কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে। নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান, মুমিন সবকিছু হতে পারে,কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

মিথ্যা বলার স্থান

দুটি স্থান এমন আছে যেখানে শরীয়ত বাস্তবতার বিপরীতে কোন কিছু বলার অনুমতি দিয়েছে। এজন্য তাকে পাকড়াও করা করা হবে না। একটি হল, স্বামীর স্ত্রীর মাঝে মনবেদনা হলে তা দূর করার জন্য কেউ বাস্তবতার বিপরীত কোন কিছু বলতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মহব্বতের সাথে থাকাকে এতই পছন্দ করেন যে এক্ষেত্রে বাস্তবতার বিপরীত কোন কিছু বললে ও পাকড়াও করবেন না, ক্ষমা করে দিবেন। দ্বিতীয় হল দু'জন মুসলমানের মাঝে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলে তৃতীয় কোন ব্যক্তি তাদের মাঝে বাস্তবতার বিপরিত কিছু বললে, শরীয়ত তার অনুমোদন দিয়েছে। এই দটি সূরত ছাড়া বাকী সব ক্ষেত্রে সত্য কথাই বলবে। কেননা সত্যে বরকত মিলে।

সত্যে সম্মান রয়েছে

অনেক সময় শয়তান আমাদের স্মৃতিপটে একথা ঢেলে দেয় যে এসময় মিথ্যা বলার মধ্যেই কল্যাণ আছে। অথচ মিথ্যায় সর্বদা অকল্যাণ। মিথ্যায় বরকত থাকে না। মিথ্যা বলার দ্বারা অসচ্ছলতা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় মনে হয় সত্য বলার দ্বারা কাজ কর্ম মন্দা হয়ে পড়ে। কিন্তু সত্য বলার

দ্বারা কখনো কাজ মন্দা হয় না। ঐ সময় একটু লজ্জা পেতে হয়, কিন্তু পরিশেষে তার সম্মান বাড়ে। এটি একটি স্থিরকৃত বিষয় যে সত্য বলার দ্বারা মানুষ কখনো অপমানিত হয় না, সর্বদা আল্লাহ তা'আলা অন্য বান্দাদের অন্তরে তার সম্মান সৃষ্টি করে দেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হল সত্যবাদীদের সম্মান আল্লাহর কাছে হয়ে থাকে।

মুসতাজাবুদ দাওয়াত কিভাবে হবে?

একটি বিশেষ কথা মনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী মানুষকে মুসতাজাবুদ দাওয়াত (যার দোয়া আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়ে থাকে) বানিয়ে দিয়েছেন। যে মহিলা মিথ্যা বলা শত ভাগ ছেড়ে দিবে, সে এমন স্তরে উপনীত হবে যখনই হাত উঠাবে, তার হাত আল্লাহ তা'আলা খালি ফিরিয়ে দিবেন না। আমাদের বুযুর্গরা বলেন, যখন মানুষের অন্তর নফসানী, শয়তানী, অবৈধ ভালোবাসা থাকবে না এবং পেট হারাম থেকে মুক্ত হবে, সে যে দু'আই করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ সর্বদা কবুল করবেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দুটি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো হালাল রিযিক ভক্ষণ, আর দ্বিতীয় হলো সত্য কথা বলা। হালাল রিযিক দ্বারা দ্বারা মুরাদ হালাল উপার্জন। আর সত্য কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হল বক্তব্য প্রদানে সত্য নিশ্চিত করা। সত্য বলার একটি ফায়দা হলো এটিকে স্মরণ রাখার প্রয়োজন নেই। যে আমি কাকে কি বলেছি? কারণ সত্যের বাস্তবতা তো কেবল একটিই। যে মহিলা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, তার স্মরণ রাখতে হয়, কাকে কি বলছে? অন্যথায় এক কথা বলার পর অন্য কথা বললে তার মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

সত্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলে

হাদীসে হযরত কা'ব বিন মালিক রহ.-এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তাবুকের যুদ্ধে তিনি যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু যেতে পারেন নি। নবী কারীম সা. যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানা করে মিথ্যা ওযর পেশ করে দিল। হুযুর সা.ও চুপ থাকলেন। কিন্তু কা'ব রাযি. নবী

কারীম সা.-এর কাছে স্পষ্ট বলে দিল, যে আমার দুটি উটনী ছিল, সুযোগও ছিল, কিন্তু যাব যাব করে অলসতার কারণে আর যেতে পারিনি। তাই বাহ্যিকভাবে সত্য বলার কারণে নবী কারীম সা. লোকদেরকে তার সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এমনকি তাকে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এভাবে মনবেদনায় পঞ্চাশ দিন তার বড় কষ্টে কেটেছে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তার দু'আ কবুল করছেন। সত্য বলায় আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি খুশী হলেন।

এক ওকীলের সত্যের উপর অবিচলতা

আমাদের নিকটেই এক ওকীল বাস করত। যৌবন কাল থেকেই খুব বাকপটু ছিল। ইউনিয়নের প্রধান ছিল। সে এমন উকীল ছিল যে তার তর্কে মানুষ হয়রান হয়ে পড়ত। মাসে তার এক লাখ রুপী ইনকাম হত। আল্লাহ্ ওয়ালাদের সান্যিধ্য পেয়ে তার অন্তরে এই খেয়াল আসল, যে আমার আখেরাতের ফিকির করতে হবে, আজ থেকে আর মিথ্যা বলব না। ওকীলের ব্যাপারে মানুষ বলে থাকে, কবি বলেন-

پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا - لو میں بھی اب صاحب اولاد ہو گیا

ওকীলকে সব ধরনের মামলা পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দা প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে যে সে মিথ্যা বলবে না। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলে স্ত্রীও তাকে বলে দিল যে, আমাদের অভাব হলেও আমি আপনার সাথে আছি। তাদের একটি ফসলি যমীন ছিল। যা দ্বারা তাদের ডাল রুটি চলত। একদিন অফিসে গিয়ে ঘোষণা দিল আজ থেকে আমি আর মিথ্যা বলব না। মিথ্যাবাদীদের সাথে থাকব না। এখন কে তার কাছে মামলা নিয়ে আসবে? কেউ মামলা নিয়ে আসলে সে প্রশ্ন করত, তুমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? শুরুতে তো সকলেই বলে দিত, যে আমি সত্য বাদী, কিন্তু সে আগেই বলে দিত মামলা চলাকালে যদি আমি বুঝতে পারি যে আপনারা মিথ্যাবাদী, তবে আমি মামলা পরিচালনা করব না। একথা শোনে লোকেরা পিছনে সরে যেত। আস্তে আস্তে তার কাছে মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। সারাদিন খালি বসে থেকে ফিরে আসত।

কিছুদিন পর মানুষ বলতে শুরু করল, সে মোল্লা হয়ে গেছে, কেউ বলল, সে মৌলভী হয়ে গেছে। কেউ বলল, সে মসজিদ মাইন্ডের হয়ে গেছে, মানুষ বিভিন্ন প্রকারের কথা বলত, কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। সারাদিন অবসর বসে চলে আসত। কেউ বলতে লাগল, যদি তুমি মিথ্যা না বল তবে কোন কাজ কর, সে বলল, না আমি যে বিষয়ে পড়ালেখা করেছি, সেই কাজই করব সততার সাথে। মানুষের কাছে তার এই দুই কথার সহাবস্থান অসম্ভব মনে হলো। এক বছর অতিবাহিত হল, তার কাছে কোন মামলা আসল না। মানুষ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল, বিভিন্ন মজলিস তাকে নিয়ে আলোচনা হত, যে কে তাকে মওলভী বানিয়ে দিল? কে তাকে এমন খারাপ বানিয়ে দিল আশ্চর্যের বিষয় যারা তার দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাতে পারত না, আজ তারা তাকে ঠাট্টা করতে লাগল। জজরাও তাকে নিয়ে হাঁসতে লাগল, কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে ছিল মজবুত।

এক বছর মোজাহাদা করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর রহমত শুরু হয়ে গেল। নেক ও দ্বীনদার লোকেরা যেমন তাবলীগ জামাতের, মাদ্রাসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা, ভালো ঘরের লোকেরাও মামলায় শিকার হয়ে পরিশেষে তারা তার কাছে আসা শুরু করল। সে অমুক মানুষ, কথায় সত্যবাদী তাহলে আমরা কেন তার কাছে যাব না। কোন মামলা নিয়ে আদালতে হাযির হলে জজরা হয়রান হয়ে যেত। জজের ধারণা হয়ে যেত যে ইহা সত্য মামলা। ফায়সালা তার পক্ষে হত। দ্বিতীয়বারও তার পক্ষে, তৃতীয়বারও তার পক্ষে। পরিশেষে জজরা অনুভব করতে পারল, যে তার মামলা বেশী উদঘাটন করতে হয় না। তার মামলা সত্য হয়ে থাকে। সত্য মামলাকারীদের ভীড় শুরু হয়ে গেল। মানুষ ডাবল টাকা দিয়ে তার কাছে মামলা নিয়ে আসত। আল্লাহর কি শান! এখন মাসে তার দুলাখ রুপী ইনকাম হতে লাগল। সত্য বলায় আল্লাহ তা'আলা তার রিযিক দিগুণ করে দিলেন। আশ্চর্য বিষয় হল, প্রশাসন অনুসন্ধান করে তাকে জজ বানিয়ে দিল। যে সে অভিজ্ঞ ও সত্যবাদী। আগে জজদের কথা শুনতে হত তাকে। আর এখন জজের চেয়ারে বসে নিজেই ফয়সালা দিতে লাগল।

মিথ্যা বলার দ্বারা বাহ্যিকভাবে বেঁচে গেলেও বাস্তবে ফেঁসে যায়। মিথ্যায় বরকত থাকে না। মিথ্যা বলার দ্বারা মানুষ আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়।

আর যে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়, মানুষের কাছে তার কোন সম্মান থাকে না। মানুষ বাহ্যিকভাবে তো তার সাথে কথাবার্তা বলে কিন্তু পিছনে তাকে খারাপ মনে করে। আর সত্য বলার দ্বারা যদিও সামনে খারাপ বলে কিন্তু তার কাছ থেকে চলে গেলে, তার অন্তর মেনে নেয় যে, সে সত্যবাদীও ভালো মানুষ। সুতরাং যদি মহিলারা প্রতিজ্ঞা করে নেয়, যে আজ থেকে সত্য বলব, ভুল হলে মেনে নিব, তবেই আল্লাহ তা'আলা তাকে কল্যাণ দান করবেন।

সত্যেই মুক্তি

কিছু হাদীস শুনুন, তাহলে আপনার বুঝে আসবে সত্য কতবড় নিয়ামত। নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান- إِنَّ الصِّدْقَ يهدي إلى البر وان البر يهدي الى الجنة! নিশ্চয় সত্য পূণ্যের পথ দেখায়, আর পূণ্য জান্নাতের পথ দেখায়।

মহিলারা কেন মিথ্যা বলে? তারা মনে করে মিথ্যায় মুক্তি রয়েছে, অথচ নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান- إن الصدق ينجي والكذب يهلك

সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে

যদি আপনি শশুরালয়ে কোন বিষয়ে ফেঁসে যান, আর ভাবেন যে এখন মিথ্যা বললে মুক্তি পাওয়া যাবে এটি ভুল। আপনি সত্য বলুন, কেননা আল্লাহর প্রিয় নবী বলেছেন, الصدق ينجي (সত্য মুক্তি দেয়) আল্লাহ তা'আলা সততার বদৌলতে আপনাকে সর্বপ্রকারের বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন। আরেকটি হাদীস শুনুন- والصدق شفيع, (সত্য আমার সুপারিশকারী) شفيع বলা হয় সুপারিশ করাকে। সুতরাং যে মহিলা সত্য বলবে, সত্য তার জন্য সুপারিশ করবে এবং মানুষের অন্তরে তার ভালোবাসা সৃষ্টি করে। খারাব পরিস্থিতি থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে সততায় সম্মানজনক জীবন লাভ হয়। কেয়ামত এমন একটি দিন যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

কেউ হযরত ফুজায়ল ইবনে ইয়ায রহ. কে সূর্যের তাপে দাঁড়িয়ে নিজের দাড়ি ধরে কাঁদতে দেখল। আর এই আয়াতটি পড়ছিল- لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ।

হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে কোরআনে সত্যবাদী বলেছেন, তাদেরকে তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তাহলে মিথ্যাবাদীদের অবস্থা কি হবে? হাদীসে এসেছে মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেন, তার নাম মিথ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্য বলার তৌফিক দান করুন। অন্তর লাগিয়ে শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত। লা'নত এর অর্থ মুফাসসীরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহর রহমত থেকে দূর হওয়া। সুতরাং মিথ্যাবাদী আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে। আর সত্যবাদী আল্লাহর রহমতের নিকটে থাকে।

তাই সত্যকে জীবনের পেশা বানিয়ে আল্লাহর রহমতের নিকটে পৌঁছতে হবে। তাহলে দুনিয়াতেও সম্মান পাবে আখেরাতেও সম্মান পাবে। আজকের এই মজলিস থেকে আমরা সত্য বলার নিয়ত করে নিব। তাহলে সত্যের বরকত আমরা জীবনে দেখতে পাবো।

বাচ্চাদের মাঝে সত্য বলার অভ্যাস সৃষ্টি করুন

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার ব্যপারে কঠোরতা করুন। কিন্তু সত্য-মিথ্যা এমন বিষয় যাতে কোন Compromise ছাড় দেওয়া যায় না। বাচ্চাদের বলুন তোমার সব ভুল ক্ষমা হতে পারে কিন্তু তোমার মিথ্যা সহ্য করা হবে না। তাহলে বাচ্চারা সত্যবাদী হয়ে যাবে।

যে শিশুকে আপনি সত্যবাদী বানিয়ে দিলেন তার অর্ধেক তারবীয়াত আপনি সহজে করে দিলেন। নিজেও সত্য বলবেন এবং বাচ্চাদেরকে সত্য বলার শিক্ষা দিবেন। এসত্য বলার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জান্নাত নসীব করবেন এবং সত্যবাদীদের কাতারে শামিল করবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পঞ্চম শর্ত

ধৈর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মাগফীরাতের পঞ্চম শর্ত

সূরা আহযাবের এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তা'আলা দশটি শর্তের বর্ণনা করেছেন। পুরুষ-মহিলা এগুলো বাস্তবায়ন করলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য ক্ষমার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ক্ষমার পঞ্চম শর্ত হল وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَات ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী।

সবর এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া, বিরত থাকা। মানুষ বিপদে আক্রান্ত হলে, স্বভাবগতভাবে অস্থির হয়ে পড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অস্থিরতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। যবান দ্বারা অভিযোগ করা হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে বারণ করা, সংবরণ করে নেওয়া এবং মুখ থেকে কোন অভিযোগের শব্দ বের না করাকে সবর বা ধৈর্য বলে।

ধৈর্যের নেকি অসংখ্য

আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, পারিবারিক জীবনে একজন মহিলা অনেক ধৈর্যধারণ করে থাকে। ধৈর্যের কারণে আল্লাহর দরবারে প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদেরকে অসংখ্য প্রতিদান প্রদান করবেন।

ধৈর্যের তিনটি পর্যায় রয়েছে

১। বিপদে ধৈর্যধারণ করা :

প্রথমত বিপদে ধৈর্যধারণ করা। যেমন সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়া, কোন নিকট আত্মীয় মৃত্যুবরণ করা। চুরি হওয়া, কোন মসীবত আসলে আল্লাহর উপরে যবান দ্বারা অভিযোগ না করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন কোন কাজ প্রকাশ না করা যার দ্বারা তার অমনোমতা প্রকাশ পায়, ইহাকেই সবর (ধৈর্য) বলে।

২। পাপাচারের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ :

দ্বিতীয় হল পাপাচারে ধৈর্যধারণ করা। আত্মা গোনাহ করতে চায় কিন্তু, তা থেকে নফসকে বারণ করাকে সবর বলে। যেমন হযরত ইফসুফ আ. নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে ধৈর্যধারণ করেছেন। প্রত্যেক মহিলার জীবনেই গোনাহের অনেক সুযোগ আসে। যদি তারা গোনাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেয়, তাহলে তারা ধৈর্যশীল নারীদের মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহর কাছে অনেক বড় প্রতিদান পাবে।

৩। আনুগত্যে ধৈর্যধারণ :

তৃতীয় হল, নেক কাজে ধৈর্যধারণ করা। নফসকে বা আত্মাকে বাধ্য করা এবং এর জন্য কষ্ট সহ্য করা। যেমন শীতের দিনে লেপের আরাম থেকে বের হয়ে অযু করে ফজরের নামায পড়া বড় মোজাহাদার কাজ। কষ্ট সহ্য করে আদেশ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আনুগত্য প্রদর্শন করাকেই 'সবর' (ধৈর্য) বলে।

ধৈর্য আলো ছড়ায়

হাদীসে এসেছে (والصبر ضياء) ধৈর্য হল আলো। অতএব বুঝা গেল অধৈর্য হল অন্ধকার। কষ্টের সময় চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলে, তা ধৈর্যের খেলাফ নয়, কারণ ধৈর্য অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়।

অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়

নবী কারীম সা. এর পুত্র ইবরাহীমকে দাফন করে নবী কারীম সা. কেঁদেছেন। কোন সাহাবী বিষয়টি দেখে আশ্চর্যবোধ করলে নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান اَلْقَلْبُ يَحزَنُ والعَيْنُ تَدْمَعُ و إِنَّا بِفراقِكَ يَا ابراهيم لَمَحْزُوْن অন্তর ব্যথিত, চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে হে ইবরাহীম, তোমার বিরহে আমরা মর্মাহত। অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের বিরোধ নয়। যবান দ্বারা অভিযোগের কথা বের হওয়া ধৈর্যের বিরোধী। যেমন কোন যুবকের মৃত্যুতে বলা হল, এই যৌবনকালেই আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যু দিয়ে দিলেন। এসকল শব্দ বলে আমরা অধৈর্য প্রকাশ করে থাকি। ঘরে কেউ অসুস্থ হল; আর একারণে বলা হল, অসুস্থতা তো আমাদের ঘর ছাড়ছেই না। এসকল অমনোপুত শব্দ যবান থেকে বের করাকে অধৈর্য বলে। যবান চুপ রাখব, যে অবস্থা আল্লাহ তা'আলা দিবেন তার উপর 'সবর' করব, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে।

দুনিয়া পরীক্ষার হল

দুনিয়া হল দারুল ইমতিহান বা পরীক্ষার হল। পরীক্ষায় বাচ্চাদের পরিচয় লেখার জন্য Question paper প্রশ্ন পত্র দেওয়া হয়। তারপর শিক্ষার্থীরা Anser sheet উত্তর পত্রে এর উত্তর লিখে। তারপর উস্তাদ দেখে কোন উত্তরটি ঠিক কোনটি ভুল হয়েছে। আর যদি উত্তর অধিক (বিশুদ্ধ হয়, তবে ঐ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ বলে গণ্য হয় এবং পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত হয়। এই দুনিয়াও পরীক্ষার হল, সকল পুরুষ মহিলার পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এটি কোন লিখিত পরীক্ষা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে Question প্রশ্ন হিসাবে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন করেন। যেমন

মসীবত, অসুস্থতা, পেরাশানী ও লাঞ্ছনা দিয়ে থাকেন। আগত সকল অবস্থাসমূহ হল প্রশ্নপত্রের মত।

এর উত্তর আমরা আমাদের আমলের মাধ্যমে লিখে থাকি এক্ষেত্রে যদি আমরা React পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি, তবে ইহাই আমাদের উত্তর হবে। আর যদি আমরা অসুস্থতা সহ্য করে ধৈর্যধারণ করি, তাহলে উত্তর যেন সঠিক হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে আমাদের উত্তর সঠিক বলে বিবেচিত হবে। আর যদি আমরা যবান দ্বারা নাশোকরী করে অধৈর্যের শব্দ উচ্চারণ করে ফেলি, তবে আমরা আল্লাহর কাছে ফেল বলে সাব্যস্ত হব। বাস্তবে তো আমরা শোকরিয়া আদায় করব। দুঃখের সময় ধৈর্যধারণ করব। ধৈর্যধারণ করার দ্বারাও জান্নাত পাওয়া যায় এবং শোকর আদায় দ্বারাও জান্নাত পাওয়া যায়।

الحمد لله এর স্বাদ

এক বুযুর্গ অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখার জন্য গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! আপনার স্বাস্থ্য কেমন? তিনি উত্তরে আলহামদুলিল্লাহ্। এত মহব্বতের সাথে বললেন, যার স্বাদ আজও আমার অন্তরে অনুভব হয়। তারাই প্রকৃত ধৈর্যধারণকারী। অসুস্থ অবস্থায় ও হালত জিজ্ঞাসা করা হলে বলে الحمدلله।

الحمد لله বলার অভ্যাস

الحمد لله বলার উদ্যেশ্য কি? উদ্দ্যেশ্য হল আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকব। এজন্য অসুস্থ ব্যক্তিকে অন্য কেউ হালত জিজ্ঞাসা করলে, বলবে الحمد لله। এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে আমি এই অবস্থায় ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর নিঃসংকোচে বলে দিবেন, যে আমার সর্দি কাশি হয়েছে। যে কষ্টই হবে বলে দিলে, ইহা অধৈর্য হবে না। এই আদবটি আমাদের মাঝে থাকতে হবে। যখন কোন পেরেশানী আসবে,

যেমন কোন যুবতী মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর কেউ তাকে সমবেদনা বলল, তাহলে প্রথমেই বলবে الحمد لله। এর উদ্দেশ্য হল আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তিনি যে অবস্থায় আমাকে রাখুক না কেন। অধিকাংশ সময় মহিলা বা শাশুড়ী কিংবা ননদের দ্বারা কষ্ট পায়। মা জিজ্ঞাসা করে বেটী কেমন আছ? প্রথমেই বলবে, الحمد لله। তারপর কিছু বলতে হলে বলবে। ইহা আল্লাহর উপর অভিযোগ হবে না। স্বামী এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি বাড়িতে ছিলাম না, তোমার কি অবস্থা? তখন প্রথমেই বলবেন, الحمد لله অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছি। এর দ্বারা ধৈর্যের প্রতিদান পাওয়া যাবে।

ধৈর্যের স্তর

উলামায়ে কেরাম ধৈর্যের বিভিন্ন স্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তর

কেউ কোন বিপদের শিকার হলে, নিজেকে সংবরণ করে অঙ্গপতঙ্গসমূহ স্থির রাখবে। যবান খুলবে না অঙ্গপতঙ্গ থেকে ধৈর্যের খেলাফ কোন বিষয় প্রকাশ করবে না অর্থাৎ ভিতরের অবস্থা নিঃসন্দেহে উত্তপ্ত হবে আর মুখে থাকবে মুচকি হাসি।

দ্বিতীয় স্তর

ধৈর্যের দ্বিতীয় স্তর হল, মানুষ পেরেশানীকে তার মাহবুবের পক্ষ থেকে উপঢৌকন মনে করে তা কবুল করে নেয়। যে আমার মালিক আমাকে এ অবস্থার সম্মুখীন করেছেন তাই আমি এই অবস্থাকে গ্রহণ করছি। এক বুযুর্গ বলেন, হে বন্ধু! খাবারের সময় যদি তুমি পোড়া সবজি পেয়ে যাও, তবে খাবারের প্রতি না তাকিয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় কর, যে আল্লাহ তা'আলা রিযিক বন্টনের সময় আমার মত তুচ্ছ নগণ্যকে ও স্মরণে রেখেছেন। এটি তো সাধারণ বিষয় নয়, যে আমার মালিক আমার স্রষ্টা আমার মত নগণ্যের কথা স্মরণে রেখেছেন। তিনি আমাকে পোড়া সবজি রিযিক হিসাবে প্রদান করেছেন। যদি এই অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে, তবে ইহা হবে ধৈর্যের উঁচু স্তর।

تیرا غم بھی مجھکو عزیز ہے + کہ وہ تیری دی ہوی چیز ہے

তোমার পক্ষ থেকে আমি যে পেরেশানীর শিকার তা আমার কাছে প্রিয়। কারণ ইহা তোমার পক্ষ থেকে পাওয়া জিনিস। এক বন্ধু বলেন, ঐ ব্যক্তির ইখলাস বা একনিষ্ঠতা বাস্তব নয় مَنْ لَمْ يَتَلَذذْ بضرب مو لا٧ যে মনিবের প্রহারে মজা পায় না। সুতরাং আল্লাহ ওয়ালারা স্বীয় মাহবুবের (আল্লাহর) পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিটি বিষয়কে উপহার মনে করেন। তাই আপনি সবসময় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। হে আল্লাহ! আমি কুফর ও গোমরাহী

ব্যতীত সর্বাবস্থায় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। দুনিয়ার জীবনে মানুষকে নিরানন্দ সর্বদা পেরেশানী, সর্বদা অসুস্থতা, সর্বদা স্বাস্থহীনতা, এমন কি সব ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ মানুষের মধ্যে আমি পর্যায়ক্রমে এই দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই। এটি (ধৈর্যের) 'সবরের' দ্বিতীয় স্তর যে, মানুষের কাছে তার মালিকের (আল্লাহর) পক্ষ থেকে যে বিপদ পৌছবে, তা উপহার মনে করবে।

বিপদে মানুষের উন্নতি

আমাদের মাশায়েখে কেরাম লিখেন, বিপদে মানুষের যে পরিমাণ উন্নতি হয় খুশীতে তা হয় না। কবি বলেন–

سکھ دکھاں تو دیواں دار

دکھاں اں ملائیم یار

আমি সুখকে দুঃখের উপর কোরবান করে দিয়েছি। ফলে দুখের বিনিময়ে প্রেমাষ্পাদের সান্যিধ্য পেয়ে গেছি। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ الْقُلُوْبِ কেউ আমাকে তালাশ করতে চাইলে দুঃখী লোকদের অন্তরসমূহে আমাকে খোঁজ করবে। যদি কোন বান্দার অন্তর ভগ্ন থাকে আর সে সবর করে, তবে সে আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে যাবে।

تو چھپا چھپا کر نہ رکھ اسے

تیرا آئنہ ہے وہ آئنہ

کہ شکستہ ہو وہ عزیز تر

ہے نگاہ آئنہ ساز ہو

কোন বিপদে মানুষের অন্তর ভেঙ্গে পড়লে সে প্রতিদান লাভ করে। এই সময় শয়তান কামনা করে, যে মহিলা কোন অধৈর্যমূলক শব্দ যবান থেকে বের করে আল্লাহর পুরস্কার থেকে মাহরুম হয়ে যাক। এমন মুহূর্তে

নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে, এবং মসীবত সহ্য করে আপনার আমলনামা পাহাড় সমপরিমাণ প্রতিদান দ্বারা পূর্ণ করে নিবেন। আপনার জন্য জান্নাত আসান সহজ হয়ে যাবে।

মানুষের নিজের চাওয়ার কারণে মসীবত

লক্ষ্য করুন কখনো কখনো মানুষ নিজের কারণেই বিপদে পড়ে। যেমন গোনাহের কারণে অথবা মানুষ নিজেই মসীবত চেয়েছে। ইহা একটি আশ্চর্যের বিষয়, আপনি হয়রান হবেন যে মানুষ কিভাবে বিপদ কামনা করে? এখন এর বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করুন যে মানুষ কিভাবে বিপদ কামনা করে? আপনি রমযান মাসে আল্লাহর কাছে দুআয় চাইলেন হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামতের দিন নবী কারীম সা. এর ঝান্ডাতলে উপস্থিত হওয়ার তওফীক দিন। তার হাতে হাউযে কাউসার নসীব করুন এবং শাফাআত নসীব করুন। আমাকে জান্নাত দান করুন। আপনার এই দুআ কবুল হয়ে গেল। এই নেয়ামতসমূহ আপনি আপনার নেক আমল দ্বারা পেতেন না। কেননা আপনার নেক আমল এত ভালো নয়। কিন্তু দুআ কবুল হওয়ায় এসকল নিয়ামত পেয়ে যাচ্ছেন। তবে এই দুআ কিভাবে পূর্ণ হবে? এই সূরতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কোন প্রকারের অসুস্থতা, মসীবত ও পেরেশানী দেন। আর বান্দা যখন ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ধৈর্য কবুল করে সে যে নিয়ামতসমূহ দুআয় চেয়েছিল তা তাকে দিয়ে দেন।

টেনশন প্রতিদান বিনষ্ট করে

বিপদ আসলে টেনশন করার কোন প্রয়োজন নেই, স্থির থাকবে। সুখে-দুখে প্রশান্তিতে থাকবে, কারণ সুখ- দুখ মিলেই জীবন। জীবন-যাপন করবে (Easy) সহজভাবে (Relax) নিশ্চিন্তে। টেনশন করবে না। ছোট মেয়েরা অল্পতে পেরেশান হয়ে যায়। টেনশন করলে আপনার প্রতিদান হাতছাড়া করে ফেলবেন। একারণে টেনশন করার কোন প্রয়োজন নেই। স্বস্তিতে থাকুন, আজ থেকে এই সবক ভালোভাবে মুখস্থ করে নেন, যে, স্থির থাকবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান ও পেয়ে যাবেন।

ধৈর্যেও জান্নাত মিলে শোকরেও জান্নাত মিলে

একটি সুক্ষ্ম বিষয় বুঝে নিন। মানুষের নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং বিপদও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ইহা তাকদীরে লিখা আছে। তাকদীরে যে নিয়ামত লিখা তা না চাইলেও আসবে, যে মসীবত লেখা আছে তা ঘৃণা করলেও আসবে। তাহলে পেরেশান হওয়ার কি প্রয়োজন? স্থির থাকুন যে আনন্দ তাকদীরে লেখা, তা আসতে দিন, খুশীতে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন। দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করুন। শোকর করার দ্বারাও জান্নাত পাবেন।

অধৈর্যে নিয়ামতের অবমূল্যায়ন হয়

কখনো কখনো খুব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। যুবতী মেয়েরা বিবাহের পর বুঝতেও পারে না কিভাবে ধৈর্যসহকারে জীবন যাপন করতে হবে। স্বামীর ঘরে এসে কোন কাজ আরম্ভ করে দিল, আর আপনি তার সাথে বহস শুরু করে দিলেন, যে আপনি ঘরে এসে আমাকে সময় দেন না। আরে ভাই! সময় চাওয়ার পদ্ধতি তো এই নয়। বরং সময় চাবে ভালোবাসার সাথে। কখনো কখনো বহস দুই ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে এবং Orguments দলীল উপস্থাপন ও চলতে থাকে। আর মহিলারা মনে করে আমার পেশকৃত প্রমাণ সঠিক। অথচ এই হুজ্জতবাজী মহিলাদের জীবনে বিষতুল্য। শয়তান চায় স্বামীর সাথে তর্ক করুক। আর স্বামী রাগ করে তাকে তালাক দিয়ে দিক। তারপর সে ধুকে ধুকে জীবন পার করবে। নিয়ামত থাকাকালে তার মূল্যায়ন করা হয় না। নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হলে এর মূল্য বুঝে আসে।

এক বুযুর্গ বলেন, হে বন্ধু! নিয়ামতের মূল্য বুঝার জন্য নিয়ামতে ছিনিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা করো না। এ কারণে লক্ষ্য করা যায়, কোন মহিলাকে তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে এমন অবস্থা বর্ণনা করে, যে দুনিয়াতে তার থেকে দুঃখী আর কেউ নেই। স্বামী সময়মত ঘরে আসে না, তার প্রতি মনযোগ দেয় না, খরচা প্রদান করে না, বেপরোয়া ভাব, অন্য মনস্ক। সারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণতা স্বামীর মাঝে দেখতে পায়। এই স্বামীই যখন

একসিডেন্ট হয় অথবা মারা যায়, তখন চোখ ধারাবাহিকভাবে অশ্রু প্রবাহিত করে। এখন প্রশ্ন করুন, কেন কাঁদছ? সে বলবে সে আমার বাচ্চাদের বাবা, আমার জন্য ছায়া ছিল, আমার সম্মানের জীবন ছিল। কোন পেরেশানী ছিল না। এখন তো আমার ঘর খালি হয়ে গেছে। এখন তার মূল্য বুঝে আসল তখন মূল্যায়ন করার মাঝে কি ফায়দা আছে? এ কারণে নিয়ামত থাকাকালে তার মূল্যায়ন করা শিখতে হবে।

সবরের তৃতীয় স্তর

সবরের তৃতীয় স্তর হল, মানুষ বিপদে খুশী থাকবে। এবং বলবে আল্লাহ তা'আলা যা দিয়েছেন তা ঠিক, এটি সবরের উঁচু স্তর।

যেদিকে মাওলা সেদিকেই শাহ দওলা রহ.

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, এক বুযুর্গ ছিল নাম ছিল শাহ দওলা রহ.। তিনি যে গ্রামে বাস করতেন তার নিকটেই প্লাবন প্রতিহত করার জন্য একটি একটি বাধ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার কি শান, একবার বন্যা আসল। পানি এত পরিমাণে বেড়ে গেল, যে মানুষ বাধ ভেংগে যাওয়ার আশংকা করল। এতে পূর্ণ গ্রাম ডুবে বহু ক্ষতি হয়ে যাবে। লোকেরা তার কাছে দুআ চাইল, যাতে করে প্লাবন সরে যায়। তিনি কুদাল নিয়ে বাধের কাছে গিয়ে খনন করা শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই কি করছেন? উত্তরে বললেন, جدہر مولی ادہر شاہ دولا (যেদিকে মাওলা, সেদিকেই শাহ দওলা)

সবরের (ধৈর্য) চতুর্থ স্তর

এই প্রকারের ধৈর্যের স্তর পূর্বের তুলনায় উঁচু। আর তা হল মসীবতে ও স্বাদ গ্রহণ করা। মসীবত আসবে আর মানুষ ইহাকে উপভোগ করে থাকে। দেখতে দেখা যায় বিপদে, কিন্তু বান্দা যখন তাতে আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকে তখন বিপদ দ্বারা সে মজা গ্রহণ করে। বিষয়টি এমন যে, যদি কারো সাথে ভালোবাসা থাকে আর সে তার বিরুপ আচরণ করে তথাপি সে তার মাহবুবের সাথে বিরুপ আচরণ করে না। আল্লাহর ক্ষেত্রে ও বিষয়টি সম্পূর্ণ

এমনই। আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বতের স্তর এমন হওয়া চাই যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকারের পেরেশানী বা বিপদ আসে, বান্দা ইহাকে Engoy উপভোগ করবে।

অসুস্থ অবস্থায় আনন্দ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এক সাহাবী ছিলেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায় খুব খুশীতে ছিলেন। কেউ প্রশ্ন করল, যে অসুস্থ অবস্থায় আপনার এত আনন্দিত হওয়ার প্রয়োজন কি? তিনি বললেন, তোমাদের কি খবর আছে যে আল্লাহ্ তাআলা অসুস্থ অবস্থায় কত সম্মান করেছেন, জিবরাঈল আমাকে সালাম দিয়েছেন। আমার কাছে ফেরেশতাদের সালাম এসেছে।

আল্লাহর সেবা শুশ্রুষা

সাইয়্যিদুনা আইয়্যুব আ.-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। অসুস্থতার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন। সুস্থতার পর কেউ প্রশ্ন করল সুস্থতা আপনার কাছে উত্তম না অসুস্থতা? তিনি উত্তর প্রদান করেন, যে সুস্থতা পেয়ে আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। কিন্তু অসুস্থতার কথা আমার এখন ও মনে পড়ে। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, অসুস্থতার কথা আপনার কেন মনে পড়ে? তিনি বলেন, যখন আমি অসুস্থ ছিলাম, প্রতিদিন সকালবেলা আল্লাহ্ তা'আলা আমার অবস্থা জিজ্ঞাস করতেন। হে আইয়্যুব! তুমি কেমন আছ? তাতে আমার এত ভালো লাগত যে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কষ্টই অনুভব হত না। তারপর সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করতেন হে আইয়্যুব! তোমার কি অবস্থা? তখন সারারাত আমার কষ্ট অনুভব হত না। ইহা এমন স্থান যেখানে বান্দা দুঃখ কষ্টে ও আনন্দ পায়। তিনি বুঝেছিলেন, যে এই কষ্ট আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকটবর্তী করার জন্য এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধৈর্যের উঁচু স্তর দান করুন।

ধৈর্যের পঞ্চম স্তর

এটি পঞ্চম ও শেষ স্তর, এই প্রকারকে تفويض বলে। تفويض এর উদ্দেশ্য হল নিজেকে অর্পণ করা। এই স্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়

হাবীব সা. কে প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর কাছে সোর্পদ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট আছি। নিজের ইচ্ছা মোতাবেক আনন্দ ও চাই না, নিজের ইচ্ছা মোতাবেক বিপদ ও চাই না। আমি আল্লাহর ফয়সালার উপর রাযী আছি। বুদ্ধিমান মহিলারা জীবনের চড়াই উৎরায়ের মূহূর্তে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা ও স্তর বৃদ্ধি করে নেয়।

এক মহিলা সাহাবীর সীমাহীন ধৈর্য

হাদীসে একটি আশ্চর্য ঘটনা এসেছে, একজন মহিলা সাহাবীর সীমাহীন ধৈর্য ছিল। হযরত উম্মে সোলাইম রাযি. একজন মহিলা সাহাবী। তার স্বামী হযরত আবু তালহা রাযি. কোন সফরে গেলেন। উম্মে সোলাইম রাযি. জানতে পারলেন যে, স্বামী অমুক দিন আসবে। তাই তিনি ঘর পরিস্কার করলেন, নিজে গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করে পরিপাটি হয়ে স্বামীর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেন। স্বামী আসতে একটু বিলম্ব হচ্ছিল, ইত্যবসরে তার পুত্র মৃত্যুবরণ করে। আত্মীয়-স্বজনদের বলে দিলেন, যাতে করে তারা স্বামীকে এই সংবাদ না দেয়। তিনি বাচ্চাকে শয়ন করিয়ে তার উপর চাদর ডেকে দিলেন।

রাত্রে স্বামীকে আসলে তাকে স্বাগত জানিয়ে, খাবার খাওয়ালেন। স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করল, পুত্রের কি অবস্থা? তিনি বললেন. সে খুব শান্তিতে আছে। (এই শব্দ) দ্বারা স্বামী বুঝে নিল যে, পুত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই এখন চলুন সকালে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। স্বামী-স্ত্রী শয়ন করল, স্ত্রী যখন দেখল যে, স্বামী প্রয়োজন পূর্ণ করে প্রশান্ত হয়েছে, এবং প্রভাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন স্ত্রী স্বামীকে বলল, একটি কথা বলতে চাই আপনাকে? সেটি হল যদি কেউ কাউকে খুশীতে আমানত প্রদান করে, কিছুদিন পর তা ফেরত চায়, তাহলে কি আমানত ফেরত দেওয়া উচিত নয়? স্বামী বলল, অবশ্যই যেমন খুশীতে সে আমান প্রদান করেছে, ঠিক তেমনি খুশীতে আমানত দাতাকে তার আমানত ফেরত দেওয়া উচিত। তারপর স্ত্রী

বলতে লাগল, তাহলে বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পুত্রের নিয়ামত দান করেছেন। আমানত হিসাবে এখন সেই আমানত আমাদের থেকে ফেরত নিয়েছেন। আমাদের পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে আপনি আল্লাহ্র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকুন। ফজরের পর আনন্দের সাথে পুত্রকে দাফন করে আসুন। আবু তালহা রাযি. বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এ খুশীতে আমার স্ত্রী আমার ধৈর্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ফজরের নামাযের পর নবী কারীম সা. কে ঘটনা শুনালে নবী কারীম সা. দু'আ করে দিলেন দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাতের মিলনে বরকত দান করেন। গর্ভ সঞ্চার হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় পুত্র সন্তান দান করেন। দ্বিতীয় বিষয় হল নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান উম্মে সোলাইম রাযি. আমার উম্মতের ধৈর্যশীলা নারী, যেমন বণী ইসরাঈলের মাঝে ধৈর্যশীলা নারী গত হয়েছে।

স্বামীকে খুশী করার জন্য মুচকি হাসবে

বর্তমানে কি কোন মহিলা আছে স্বামীকে খুশী করার জন্য এই ধরনের কোরবানী দিবে? আমরা তো সামান্য বিষয়ও সহ্য করতে পারি না। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সীমাহীন পছন্দনীয় কাজ। মহিলা সাহাবীর এই আমল আমাদেরকে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট নয় কি? আমরা স্বামীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে রেগে যাই। মুচকি হাসা অসম্ভব হয়ে যায়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন হয় স্বামীর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। তাই স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসবেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন, স্বামীকে ভালবাসবেন। এমনভাবে থাকবেন যেন স্বামী ব্যবসাও কাজকর্ম শেষ করে স্ত্রীর কাছে দ্রুত চলে আসে। এমন যাতে না হয়, যে স্বামীকে অসুন্তুষ্ট করে বাহিরে পাঠালেন, আর স্বামী ঘর থেকে বের হতে বলে, আল্লাহ্র শোকর ঘর থেকে বের হয়েছি, এখন এই ঘরে না ফিরলেই ভালো হয়। তাই বিভিন্ন অবস্থায় ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়া যাবে।

মহিলাদেরকে প্রতি কদমে কদমে ধৈর্যধারণ করতে হয়

আমি লক্ষ্য করেছি যে, মহিলাদের জীবনে কদমে কদমে ধৈর্যধারণ করতে হয়। চলুন সামান্য আলোচনা করি

মাতা-পিতার ঘরে ধৈর্য

কন্যা সন্তান অবিবাহিতা হলে তখন ও ধৈর্যধারণ করতে হয়। যেমন মা-বাবা কোন কারণ ছাড়াই তিরস্কার করল। এই অকারণে তিরস্কারে চুপ থাকা ও ধৈর্য। কখনো কখনো ভাই ধমক দেয়, খারাপ আচরণ করে, এই অবস্থায় ভায়ের জন্য বদদু'আ না করে দু'আ করা ও সবর বা ধৈর্য। মেডামের কাছে পড়তে হয়, পড়ায় সামান্য ভুলের কারণে মেডাম, তিরস্কার, প্রহার,ও অপমান করে থাকে, এক্ষেত্রে ও ধৈর্যধারণ করতে হয়। অবিবাহিত যুবতী মেয়েকে নিকটাত্মীয় অথবা অন্য গায়রে মাহরাম শয়তান ছেলেরা ইভটিজিং করে থাকে, তারা গোনাহের বিস্তার করে। যেমন মাছ শিকার করার জন্য ঝাল বিস্তার করা হয়। তাদের সাথে মোবাইলে কথা বলবে না এবং সামনে বেপর্দায় আসবে না এবং তাদেরকে কথা বলার সাহস দিবে না। নিজের আত্মাকে সংবরণ করবে। ইহা ও সবর বা ধৈর্য। একদিকে ঘরের তিরস্কার ও ধমকি অন্যদিকে গায়রে মাহরামদের প্রশংসার পাল বাধা। তাই নফস চায় যে তাদের কথা শুনি, তাদের তুলনায় কল্যাণকামী দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই। এটি শয়তানের ফাঁদ। কিন্তু ভালো মেয়েরা এসকল শয়তানদেরকে তিরস্কার করে দেয়। কথা বলার মত দুঃসাহস তাদেরকে দেয় না। তাই এই ক্ষেত্রে নিজেকে বাচিয়ে রাখলে ও সবরের (ধৈর্যের) সওয়াব পাওয়া যাবে।

বিবাহের পর ধৈর্য

মেয়ের বিবাহ হলে স্ত্রী হিসাবে তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। যেমন অনেক সময় স্বামীর অবজ্ঞা, অযথা তিরস্কার, খামাখা রাগ করা ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। কাজ ও করার পরও স্বামীর কোন প্রশংসা ও নেই। স্বামীকে বলা হল, অমুক জিনিস প্রয়োজন, কিন্তু অধিকাংশ সময় স্বামী তা পূর্ণ করে না। তাই লক্ষ্য করুন অসংখ্য স্থানে বেচারীকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। বউ হওয়ার দৃষ্টিকোণ লক্ষ্য করুন, শাশুড়ীর তিরস্কার, ননদের আজীব বিরল কমেন্ট শুনতে হয়। কখনো কখনো মনোমালিন্য হয়। আবার কখনো আপত্তি তোলা হয়, যে তুমি আমার পুত্রকে বিগড়ে দিয়েছো। অথচ পুত্র পূর্ব থেকেই এমন ছিল। শাশুড়ী তার মাথায় বুঝা ঢেলে দেয় এবং কখনো কখনো সামান্য বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে (বাবার বাড়ী) ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

মা হিসেবে ধৈর্য

যদি মহিলা মা হয়ে যায়, তবে তাকে বহু সবর করতে হয়। উদাহরণ স্বরুপ গর্ভকালীন সময় নয় মাস অসুস্থ অবস্থায় কাটাতে হয়। এই কষ্টে তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। তারপর বাচ্চা প্রসব করা একটি বিপদজনক ঘাটি। এই ভীষণ কষ্টেও তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। তারপর বাচ্চার লালন-পালন বিশ ঘন্টাই বাচ্চার সেবা করতে হয়। না ইচ্ছামত আহার করা যায়, না পান করা যায়, না ঘুমানো যায়। বাচ্চার দু'চার বছরের ডিউটির কষ্টে ও তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। বাচ্চা বড় হওয়ার পর পড়ালেখা করে না, মার চেষ্টা থাকা সত্ত্বে ও সন্তান ভালো হয় না, এ ক্ষেত্রে ও মাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। তারপর সন্তান বড় হলে বিবাহ-শাদী করাতে হয়, বিবাহের পর মেয়ে তার ঘরে সেট না হলে, ছেলে তার ঘরে সেট না হলে, সন্তানের দু:খে মাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মহিলাদের জীবনে মা হওয়ার কারণে যে ধৈর্য ধরতে হয়, এর চেয়ে আর বড় ধৈর্য নেই। সন্তান অযোগ্য অবাধ্য হলে মার অন্তর কষ্ট পায়। সন্তান অবাধ্য হলে মা কাউকে বলতে ও পারে না। কার কাছে অভিযোগ করবে? সন্তান জন্ম দিয়েছে নিজেই, নিজের সন্তান। কার কাছে গিয়ে বলবে। এখন চিন্তা করুন হযরত মারয়াম আ. মায়ের পেটে থাকাকালে তার মা দু'আ করলেন– رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ মা গর্ভকাল থেকেই সন্তানের জন্য দু'আ করতে থাকেন। তারপর সন্তান যুবক হয়ে অবাধ্য হলে মা এমন কষ্ট পান যা অন্য কেউ পেতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও মাকে ধৈর্য ধরতে হয়। তাই মাকে দু'আ করতে হয়, হে আল্লাহ! সন্তান কষ্ট দিচ্ছে, আমাকে সন্তানের কষ্ট থেকে বাচান। সন্তানের পেরেশানী থেকে বাচান। হে আল্লাহ! সন্তানকে ভালো বানিয়ে দেন। মা এভাবে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তানের জীবন পরিবর্তন করে দেন। তাই আমি মনে করি যে, মহিলা সারা জীবন ধৈর্যের নিয়ামত হিসাবে নিজেকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে নেয় বড়ই সৌভাগ্যবান সে সকল মহিলারা যারা সবরের (ধৈর্যের) জীবন-যাপন করে আল্লাহর মাকবুল বান্দী বনে যান।

ষষ্ঠ শর্ত

খুশূ তথা-বিনয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মাগফিরাতে ষষ্ঠ শর্ত

এটি বাইশ পারার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াত। এতে আল্লাহ তা'আলা মুমিন নর-নারীর জন্য দশটি শর্ত বর্ণনা করেছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তা থেকে ষষ্ঠ শর্ত হল والخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ মুফাসসীরীনে কেরাম এর অনুবাদ করেছেন, বিনয়ী পুরুষ বিনয়ী নারী।

খুশূ এর মাকসাদ

'খুশূ' এর অর্থ হল, বিনয়, নম্রতা, ভয়। মুহাক্কীক উলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন সংঙ্গা প্রদান করেছেন। কেউ বলেন, الخُشُوْعُ التَّذَلُّلُ مَعَ خَوْفٍ وسُكُوْنٍ لِلْجَوَارِحِ খুশূ হল ভয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ সংযত রেখে বিনয় প্রকাশ করা।

হযরত কাতাদাহ রহ. বলেন, অন্তরের খুশু হল আল্লাহকে ভয় করা, এবং দৃষ্টি সংযত রাখা।

মুজাহিদ রহ. বলেন, انه غض البصر و خفض الجناح। চোখ সংযত রেখে বিনয়ের সাথে ঝুকানোকে 'খুশু' বলে। হযরত আলী রাযি. বলেন, تَرْكُ الِالْتِفَاتِ خُشُوْع সর্বদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, খুশুওয়ালা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে।

ভয় বিনয় সৃষ্টি করে

খুশু এর সহীহ অর্থ হল, আল্লাহর অসন্তুষ্টকে ভয় করে গোনাহ পরিহার করা। এ কারণে কোন কোন মুফাসসীর খুশু এর অনুবাদ 'ভয়' বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর সম্মান ও প্রতাপের কারণে ভয় থাকে এবং এর কারণে গোনাহ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকাকে খুশু বলে। এটি আল্লাহর শান যে বান্দা আল্লাহকে ভয় করবে।

হতাশা ও ভয়ের মাঝে পার্থক্য

দুটি শব্দ, একটি হল হতাশা আর অপরটি হল خوف অর্থ হলো ভয়। ভয় দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল ভিতরের ভয় আরেকটি হল বাহিরের ভয়। ভিতরের ভয়কে حزن বলে আর বাহিরের ভয়কে خوف বলে। একারণে যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তিত থাকবে। জান্নাতে প্রবেশের পর বলবে "الحمد لله الذى" সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি আমাদের থেকে দুঃখ পেরেশানী দূর করেছেন। অন্তরের পেরেশানী চলে গেলে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। خوف (ভয়) ব্যাপকভাবে শাস্তি আদায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন সাপে কাটার ভয়, চোরের চুরির ভয়, ঘাতকের হত্যার ভয়। বাহিরের ভয়কে خوف বলে। মুমিন আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকর্তা, আর বান্দা তার মাখলুক। তিনি আমাদের মুনিব অথবা তার বান্দা। তারপরও আমরা তার অলসতা করে ফেলি।

আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা খেয়াল খুশির অনুস্মরণকারী লোকদেরকে শাস্তি দিবেন। فلما أسفونا انتقمنامنهم (যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি তাদের শাস্তি দিলাম। তারা আল্লাহর উপর আস্থা না রাখায় আল্লাহ তা'আলা أسفونا শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ ফরমান, إِنَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ (আমি অপরাধিদের শাস্তি দিব। সুতরাং অলসতা, উদাসীনতা ও গোনাহের শাস্তির ভয়কেই خوف বলে। এর উপমা এভাবে বুঝাতে পারেন, যে কোন বাচ্চা মূল্যবান একটি বস্তু ভেঙ্গে গোপনে বসে থাকল, কিন্তু তার এই ভয়ও থাকে যে আম্মু জানতে পারলে থাপ্পড় লাগাবে, আব্বু জানতে পারলে তিরস্কার করবে। বান্দার অন্তরে গোনাহের কারণে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর যে ভয় আসে তাকেই خوف বলে।

ডাবল প্রতিদান

অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকাও ইবাদত, এরদ্বারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ولمن خاف مقام ربه جنتان যে প্রতিপালকের সমীপে দাঁড়ানোর ভয় করে তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! দুটি জান্নাত পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে দুটি ঘর বানানো হয়, একটি কর্মস্থানের ঘর, আরেকটি হল মেহমানখানা। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ও বিশাল ঘর দান করবেন, একটি থাকার জন্য আরেকটি মেহমানখানা। এমন নয় যে প্রথমে এক ঘরে থাকবে তারপর অন্য ঘরে চলে যাবে।

ভয় একটি স্বভাবজাত বিষয়

ভয় একটি স্বভাবজাত বিষয়। ভালো মানুষেরও ভয় থাকে, খারাপ মানুষেরও ভয় থাকে। কিছু কিছু সময় স্বাভাবিকভাবে মানুষ ভয় পেয়ে থাকে। কোরআন থেকে শুনুন।

হযরত মূসা আ. কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে দেখলেন বণী ঈসরাঈলের এক লোক আরেক লোকের সাথে ঝগড়া করছিল। হযরত মূসা আ. চাইলেন তার সম্প্রদায়ের লোকটিকে বাঁচাতে। কেননা অপর লোকটি বণী

ঈসরাঈলের লোকটির উপর বাড়াবাড়ি করছিল এবং তাকে অধিক মারধর করছিল। হযরত মূসা ঝগড়া ছাড়াতে গিয়ে একটি ঘুষি দিলে লোকটির নাক উড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তা'আলা এতই শক্তি দিয়েছিলেন যে এক ঘুষিতেই লোকটির মৃত্যু হয়। আল্লাহর কি শান কিছুদিন পর হযরত মূসা আ. কোথাও যাচ্ছিলেন। তার সম্প্রদায়ের ঐ লোকটিকেই আবার অন্য আরেকজন লোকের সাথে ঝগড়া করতে দেখলেন। হযরত মূসা আ. চাইলেন যে, বেচারা মার খাচ্ছে, আমি তাকে বাঁচাবো। হযরত মূসা আ. তাকে বাঁচানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলে সে ভুল বুঝল যে আজকে হয়ত মূসা আমাকে প্রহার করবে। একথা চিন্তা করে সে বলতে লাগল হে মূসা! গতকাল এক লোককে হত্যা করেছো আজ আমাকে হত্যা করতে চাও।

এখন ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেল। আলোচনা হতে হতে ফেরাউনের কাছে খবর পৌঁছে গেল। ফেরাউন সাথে সাথে তার মন্ত্রীবর্গকে ডেকে বলল, দেখ! এখন আমাদের সুযোগ এসেছে। আগে তো আমাদের কোন বাহানা ছিল না। এখন তো সে একটা লোককে হত্যা করেছে তাই তাকে হত্যা কর ফাঁসিতে ঝুলাও। সে তার মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ভালো ও কল্যাণকামী মানুষ সব জায়গাই থাকে। ফেরাউনের মন্ত্রী পরিষদে একজন ভালো মানুষ ছিল। তার মজলিস শেষ হলে এসে বলে দিল- إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ। মন্ত্রীবর্গ আপনার হত্যার ব্যাপারে প্লান করছে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনি কি করবেন। فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ আপনি এখান থেকে চলে যান, আমি আপনার কল্যাণকামী। فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন, পিছনে কোন পুলিশ আসছে কিনা দেখতে লাগলেন। অথচ তিনি ভবিষ্যত যুগের নবী হবেন, তারপরও অন্তরে ভয় ছিল। তাই বুঝা গেল, এটি স্বভাবজাত বিষয়। নবুয়্যতও বেলায়েতের বিরোধী নয়। তাই তিনি দুয়া চাচ্ছিলেন رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ হে আমার প্রতিপালক! জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্তি দেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে মাদায়েন শহরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পয়গাম্বর শোয়াইব আ. ছিলেন। তিনি বার্ধক্যে অন্ধ হয়ে

পড়েছিলেন। তার দুই কন্যা বকরী চরাত। মূসা আ. সেখানে আরাম করতে চাইলেন, পাশে একটি কূপ ছিল। লোকেরা পশুদের পানি পান করিয়ে চলে গেছে। শুধু দুটি মেয়ে নিজেদের বকরীগুলোকে অবশিষ্ট বেঁচে যাওয়া পানি পান করাচ্ছে।

হযরত মূসা আ. সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, তোমরা কেন এগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না? তারা বলল, সম্প্রদায়ের লোকেরা কূপ থেকে পানি তোলা শেষ হলে কূপে ঢাকনা লাগিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা বৃদ্ধ। আমরা ছোট মেয়ে, কূপের ঢাকনা সরাতে পারি না। তাই অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পানি বকরীগুলোকে পান করিয়ে নেই। হযরত মূসা আ. বুঝে ফেললেন যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যা আছে। যে সম্প্রদায় থেকে এসেছি সেখানে সমস্যা বিদ্যমান। হযরত মূসা আ. বললেন, আমি বকরীগুলোকে পানি পান করিয়ে দিচ্ছি। তিনি একাই ঢাকনা সরিয়ে পানি পান করিয়ে দিলেন। আল্লাহর কি শান! মেয়েরা আশ্চর্য হয়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা তাকে কত শক্তি দান করেছেন। মেয়ারা গিয়ে পিতার কাছে কারগোযারী শুনাল। এভাবে যে, আজ আমাদের বকরীগুলোকে আল্লাহর এক বান্দা পানি পান করিয়েছে, এর সাথে সাথে এই পরামর্শও দিল যে, আব্বাজান, আপনি তো কাউকে না কাউকে কাজের জন্য রাখবেনই। আপনি এই লোকটিকে কাজের জন্য রেখে দেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, উত্তম শ্রমিক সে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। তিনি পাথর উঠানোর সময় সে তার শক্তি দেখেছিল, আর তার আমীন হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে তার দৃষ্টি অবনত রাখার কারণে। বর্ণিত আছে কিছু বান্দার ফিরাসাত বা অন্ত দৃষ্টি বিরল ছিল। তার মধ্যে হযরত শোয়াইব আ. এর কন্যার ফিরাসাত। সে মূসা আ. কে দেখেই তার নবুওয়তের বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল, যে তিনি নবী হবেন। তিনি খুব নিস্কলুষ ও পুতঃপবিত্র বান্দা। এই কারণে পিতাকে পরামর্শ দেন তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করতে।

শোয়াইব আ. মেয়েকে পাঠালেন তাকে ডেকে আনার জন্য। তিনি মূসা আ. কে বললেন, আমাদের পিতা আপনাকে ডাকছে, আপনাকে প্রতিদান

দেওয়ার জন্য। কেননা আপনি আমাদের বকরীকে পানি পান করিয়েছেন। মূসা আ. বললেন, ঠিক আছে তুমি পিছনে থেকে আমাকে পথ দেখাও, আমি সামনে চলছি। আল্লাহর কি মহিমা! সাধারণত পথপ্রদর্শক সামনে থাকে, কিন্তু হযরত মূসা আ. এর মজবুত তাকওয়ার কারণে পিছনে চললেন, যাতে তার উপর দৃষ্টি না পড়ে। এভাবেই তিনি হযরত শোয়াইব আ. এর ঘরে পৌঁছে যান। উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। হযরত শোয়াইব আ. বলেন, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً নয় বছরের আলোচনা হয়। কিন্তু তিনি দশ বছরের ইচ্ছা করেন। তারপর সবকিছু খুলে বললেন, কিভাবে পৌঁছলেন। সবকিছু শুনে হযরত শোয়াইব আ. বলেন, نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ তুমি জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই বুঝা গেল ভয় একটি স্বভাবজাত বিষয়। فَأَوْجَسَ فِىْ نَفْسِه خِيفَةً লাঠি তার সামনে সাপে পরিণত হওয়ায় হযরত মূসা আ. ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। বহিরাগত কোন কারণে ভয় পাওয়াকে خوف বলে। মুমিন আল্লাহকে ভয় করে, কেননা সে কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। যে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হলে শাস্তি পেতে হবে।

'খশয়াত' কাকে বলে?

'খশয়াত' শব্দের অর্থও ভয়। কিন্তু তার প্রকার ভিন্ন। خشيت হল শাস্তির ভয়। خشيت হল অসন্তুষ্ট হওয়ার ভয়। যেমন স্ত্রী স্বামীকে ভয় করে, তবে তা এ কারণে নয় যে যদি আমি সময়মত খাবার প্রস্তুত না করি, স্বামী আমাকে জুতা মারবে, বরং স্বামী মাইন্ড করবে কষ্ট পাবে, সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ভালবাসার কারণে স্ত্রী স্বামীর অসন্তুটি যে ভয় পায় ইহাকেই خشيت বলে। লক্ষ করুন! এক কালো, বিশ্রী মহিলাকে বাদশাহ তার ঘরের বুয়া হিসাবে রাখল। এখন তার আশা বেড়ে গেল, যে আমি তো মানুষের বাড়ির টয়লেট পরিষ্কারের উপযুক্ত ছিলাম, কিন্তু বাদশাহ আমাকে পরিষ্কারের কাজে নিয়েছেন। শয়ন কামরা পরিপাটি করার কাজ দিয়েছেন। এখন তার অন্তরে একটি ভয় থাকে, যে আমার কোন ভুলের কারণে বাদশাহ যেন আমাকে সরিয়ে না দেন। এখানে শাস্তির ভয় নয় বরং কাজ

থেকে মাহরুম হওয়ার ভয়। এ ধরনের ভয়কে حشيت বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إنما يخشى الله من عباده العلماء নিঃসন্দেহে উলামায়ে কেরাম আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় আলেমদের অন্তরে সর্বদা। এই ভয় থাকে আমার কাজ যেন এমন না হয়ে যায় যার দ্বারা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের ভয়কে خشيت বলে।

নবী কারীম সা.-এর ভয়ের স্তর

নবী কারীম সা. বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় পাই। তাই নবী কারীম সা. দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার প্রতি খুশী থাকেন তবে আমার কোন কিছুর পরোয়া নেই। আর যদি আপনি আমার প্রতি নারাজ থাকেন তবে আপনি যতক্ষণ খুশী না হবেন, আমার উপর আপনাকে খুশী করা আবশ্যক। আল্লাহু আকবার! এর কারণ কি? কারণ আল্লাহর নৈকট্যভাজন। নেককার আলেমের কাছে আল্লাহর রাগ বড় কষ্টদায়ক। এর চাইতে বড় কষ্টের কোন কিছু নেই তাদের কাছে। এর কারণে মহব্বতের পাগল যদি জানে যে একথায় প্রেমাস্পদ কষ্ট পাবে তবে সে কখনো তা বলবে না। সর্বদা তার স্মৃতিপটে থাকবে যে আমার অফিসার যাতে রেগে না যায় প্রেমাস্পদ রেগে না যায়। আল্লাহ তা'আলা রেগে না যান। এই ধরনের ভয়ের মাঝে ভালবাসার প্রাধান্য রয়েছে।

নামাযে খুশু খুযু

নামাযে খুশু-খুযুর অর্থ হল, অঙ্গসমূহকে আদবের সাথে রাখা। নাড়াচড়া না করা। এদিক সেদিক না তাকানো। বরং দাঁড়ানো, রুকু ও সিজদায় যেখানে দৃষ্টি রাখা উচিত সেখানে রাখব। কাপড়, দাড়ি দ্বারা খেলা করবে না। কিছু মানুষ তো নামাযেও খেলা করে। আমরা একস্থানে নামায পড়ছিলাম, একলোক ধারাবাহিকভাবে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ফুটাল, তারপর অপর হাতের আঙ্গুলসমূহ ফুটাল, আমি মনে মনে বললাম, নামাযে দাঁড়িয়ে পায়ে হাত নেওয়া যায় না, যদি নেওয়া যেত তবে সে পায়ের দশ আঙ্গুল ফুটাত।

কিছু লোকের নামাযে সর্বদা হাত নাড়াচড়া করা, কাপড় ঠিক করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। অথচ নামাযে বেশি নাড়া-চড়া করলে নামাযই নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে তাদের ধারণাই থাকে না।

আজীব তামাশা

হারাম শরীফে এক লোক আমার পাশে নামাযে দাঁড়াল! ফোন আসলে ফোন বের করে বলল, Darling (প্রিয়া) أُصلي আমি নামায পড়ছি। ইংলিশ আরবী মিলিয়ে।

এটি হল ডালিং, أُصلي এক আজব নামায। হজের মৌসমে ও আজীব আজীব তামাশা নযরে আসে। আমাদের এক সাথী ভাবল, যে বিদায়ী তওয়াফ খুব খুশ খুযুর সাথে করবে। দৃষ্টি উঠাবে না, অন্য কিছুই করব না। আল্লাহর কাছে বিনয়ী হব–

عشق کو حسن کی انداز سکھالو تو چلوں

منظر کعبہ نگا ہو یو سالون تو چلوں

باب کعبہ سے منہ فھرا ایک بار لیٹ کر رو لو

اور چند اشک ندامت کی بھالو تو چلو

ভালবাসা সুন্দর করে শিখে নিতে চাইলে কাবার পথে চল। কাবার দৃশ্য দেখে দৃষ্টি জুড়াও। কাবার দরজা জড়িয়ে আল্লাহর কাছে রোনাযারী করে নাও। সামান্য অশ্রু অনুতাপের সাথে প্রবাহিত করতে কাবা অভিমুখে রওনা কর। আখেরী তওয়াফ এমনই হওয়া চাই। সে বলে আমি তওয়াফ করছিলাম। কিছু মানুষের নিয়ম হল তারা স্ত্রীকে তওয়াফ করিয়ে থাকে, কাপড় ঠিক রাখতে বলা হয়। কেউ কেউ তো মাশাআল্লাহ এতই মহব্বত যে স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে স্ত্রীকে তওয়াফ করায়। সে বলল পিছন থেকে মহিলা এসে স্বামীকে চড় দিয়ে বলল, কাকে তওয়াফ করাচ্ছ? তখন স্বামী বুঝল সে তো সাদা কাপড়ের অন্য কেউ। সে বলল, তার স্ত্রী হজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য সামনে বাড়ল। পিছনে সে অন্য মহিলার হাত ধরে ফেলল। হে আল্লাহ, কী আজীব তামাশা!

এখন যমযমের স্থান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সিরিয়াল থাকত তাই নীচে যেতে হত। একটি ছিল পুরুষের স্থান আরেকটি হল মহিলার স্থান। সাধারণভাবে পুরুষ মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের অপেক্ষায় থাকত। কেউ দু' মিনিটে কেউ দশ মিনিটে ফিরে আসত।

এক বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে খোঁজ করছিল এবং বৃদ্ধা তার স্বামীকে খোঁজ করছিল। তারা উভয়ে একটু নিকটবর্তী হলে স্বামী স্ত্রীকে দেখতে পেল, সবার ইহরামের কাপড় সাদা ছিল। দেখা মাত্রই বলতে লাগল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বৃদ্ধা ও বলতে লাগল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? স্বামী আগে বেড়ে বলেছিল, ঠিক আছে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে চল। যখন উভয় কাছাকাছি হল, স্ত্রী স্বামীকে মনোযোগ দিয়ে দেখল এবং বলতে লাগল, তোমার দাড়ি কোথায়? আরেকটু কাছে এসে দেখলে, যে সে অন্য কেউ (তার স্বামী নয়) তখন বলল, আপনি আমার স্বামী নন। বৃদ্ধ ভালভাবে দেখার পর বলল, আপনি তো আমার স্ত্রী নন। (মাশাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার!) তো আলোচনা চলছিল নামাযের। সেখান থেকে চলে আসল হারাম শরীফের আলোচনা।

নামাযের অবস্থা দেখুন, নামাযে কথা বলছে আর ভাবছে নামায নষ্ট হচ্ছে না। অথচ নামায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছু মানুষের নামায (মাশাআল্লাহ) এত মজবুত যে কথা বলার দ্বারা ও তাদের নামায নষ্ট হয় না। নামাযে খুশু খুযুর উদ্দ্যেশ্য হল, প্রতিটি অঙ্গ আপন স্থানে আদবের সাথে রাখবে। দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার স্থানে রাখবে। রুকু অবস্থায় দৃষ্টি রাখবে পায়ের আঙ্গুলের দিকে। বৈঠকের সময় উরুর দিকে। সিজদাতে গিয়ে নাকের দিকে দৃষ্টি রাখবে। এদিক সেদিক তাকাবে না, ঝুলন্ত দাড়ি নিয়ে খেলবে না, বাহ্যিকভাবে এভাবে ভদ্রতার সাথে নামায পড়া। ইহাকে নামাযের খুশু বলে। নবী করীম (সাঃ) এক লোককে বলেন যে, নামাযে দাড়িতে হাত দিচ্ছিল لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هذا خَشَعتْ جَوَارِحُه যদি তার অন্তরে খুশু খুযু থাকত, তবে তার হাতেও খুশু খুযু থাকত। অর্থাৎ দাড়ি নিয়ে খেলত না। নবী কারীম সা. হাদিসে ও خشوع শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই বুঝা গেল, নামাযে খুশু খুযুর উদ্দেশ্য হল, খুব আদব, ও মনযোগের

সাথে সুন্দরভাবে নামাযের রোকনসমূহ আদায় করা। অন্তর এদিক সেদিক উদাসিন না থাকা, অঙ্গসমূহ গাফেল না থাকা। একে নামাযের খুশু বলে।

খুশু এর সম্পর্ক পূর্ণ শরীরের সাথে

নামায ছাড়া খুশু এর সম্পর্ক পূর্ণ শরীরের সাথে। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে বান্দা বিনম্র হয় তার মাঝে আটটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কের (خشوع) একাগ্রতা

خشوع এর প্রথম আলামত দেমাগে অর্থাৎ নিয়তের মধ্যে। যার মস্তিষ্কে একাগ্রতা থাকে তার নিয়ত সর্বদা ভালো থাকে। নিয়ত খারাপ থাকে না। কিছু মানুষের নিয়ত সর্বদা অপবিত্র হয়ে থাকে। কিছু মানুষের নিয়ত ভাল হয়ে থাকে। আর এই নেক নিয়ত হল خشوع এর প্রথম আলামত। নেক নিয়তের উদ্দেশ্য হল সকলের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া এবং ভালো আচরণ করা। যে বান্দার চিন্তা হল সকলের সাথে ভালো আচরণকারী হবে, ইহা خشوع এর প্রথম নির্দেশন।

হযরত বাহু রহ. বলেন–

যদি ধৌত করা ও ডুবানোর মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যেত তাহলে মাছ ও কচ্ছপ আল্লাহকে পেয়ে যেত। কেননা এগুলো সবসময় পানিতে থাকে।

যদি আত্মা কন্ট্রোল করার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যেত, তাহলে যে ষাড়ের খাসী বানানো হয়েছে, সেই ষাড় আল্লাহকে পেয়ে যেত। কারণ সে সম্পূর্ণ পৃর্থক থাকে। (অন্ডকোষ কাটা থাকার কারণে)

চকমকে কালো একটি পাখি যে সর্বদা যিকির করতে থাকে। যদি যিকির করার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যেত তবে সে পেয়ে যেত। পরিশেষে বলেন, যদি কেউ আল্লাহকে পায় তবে ভালো নিয়তের কারণেই পেয়ে থাকে।

অতএব خشوع বা একাগ্রতার সর্বপ্রথম নিদের্শন প্রকাশ পায় মস্তিষ্কে। নিয়ত সর্বদা ভালো থাকা উচিত। সকলের প্রতি কল্যাণকামী ও ভালো আচরণ করা চাই। কারণ আমলের উপর নিয়তের ফজীলত রয়েছে।

চোখের خشوع বা বিনয়

দ্বিতীয় নিদর্শন হল চোখ বারণ করা। দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি পড়লেও তা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে। অবৈধ বস্তু থেকে চোখ বিরত রাখা। যখন মাখলুক (সৃষ্ট) থেকে চোখ সরবে তা খালেকের (স্রষ্টা) প্রতি নিবদ্ধ হবে। দলীল কোরআন থেকে শুনুন, এক রুকুতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ হে নবী! আপনি মুমিনদের বলে দিন, যাতে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। কোরআনের এ আয়াতে দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলা হয়েছে। আর অপর আয়াতে বলেন, اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহ তা'আলা (আসমান যমীনের জ্যোতি) মুফাসসীরীনে কেরাম উভয় রুকুর মাঝে সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন, যে বান্দার দৃষ্টি হারাম থেকে সরবে, সে আল্লাহর নূর দেখতে পাবে।

দৃষ্টি সরানোর হুকুম

আল্লাহ তা'আলা দুই বস্তু থেকে দৃষ্টি সরানোর আদেশ প্রদান করেছেন, আর এক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে আদেশ প্রদান করেছেন। কোরআন থেকে শুনুন। কোন দুটি জিনিস থেকে দৃষ্টি হটানোর আদেশ প্রদান করেছেন। এক মাল বা ধনসম্পদ থেকে। দুই জামাল বা সৌন্দর্য থেকে। কারো জন্য ধনসম্পদ, কারো জন্য সৌন্দর্য ফেতনা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার পেয়ারা হাবীব وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ আমি তাদেরকে রকমারী পার্থিব যে নিয়ামত দিয়েছি আপনি তার প্রতি দৃষ্টি সম্প্রসারণ করবেন না। আমি কাফেরদেরকে দুনিয়ার যে ধন ভান্ডার ও সৌন্দর্য দিয়েছি, আপনি উহার প্রতি দৃষ্টি তুলে তাকাবেন না। তাই এক সম্পদ থেকে, দুই সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টি হটানোর আদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ হে নবী! আপনি মুমিনদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।

দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আদেশ

আর যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তা হল আল্লাহওয়ালাদের চেহারা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান হে আমার পেয়ারা হাবীব! وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ আপনি নিজেকে আবদ্ধ রাখুন ঐ সকল লোকদের সাথে যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তার সন্তুষ্টি লাভের আশায়। এরকম বান্দাদের সাথে কি করা উচিত وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না, যারা পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। দুই বস্তু থেকে দৃষ্টি ফিরানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর এক এক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ভয় এসে গেলে, সব ক্ষেত্রেই নিয়ম ভাল হয়ে থাকে। আর নির্দশন হল দৃষ্টিকে কাবু করে ফেলা অর্থাৎ হারাম থেকে বাঁচানো হালালের প্রতি তাকানো, এবং শিক্ষালাভের জন্য তাকানো।

কানের خشوع (বিনয়)

চোখের নিচে হল কান। কানের খুশু হল মানুষ হারাম আওয়াজ হারাম মিউজিক থেকে কানকে বাঁচিয়ে রাখবে। গান শোনা, ফোনে মাহরাম মহিলা ছাড়া অন্য মহিলাদের সাথে কথা বলা থেকে কান বাঁচিয়ে রাখাকে কানের خشوع বা বিনয় বলে।

মোবাইলের রিংটোন

বর্তমানে শয়তান অবস্থা এতই খারাপ করে দিয়েছে যে নতুন সব মোবাইলে গানের রিংটোন থাকে। আমার তো ধারণাই ছিল না যে, গান রিংটন হতে পারে। হজে তওয়াফ করার সময় এক যুবকের মোবাইলে ইন্ডিয়ান গানের রিংটোন বাজতে লাগল। আমরা আশ্চর্য হলাম যে ইন্ডিয়ান গান নিয়ে তওয়াফ করছে। সেদিন আমার বুঝে আসল যে মোবাইলের রিংটোনের পরিবর্তে মানুষের কানে গায়কদের গানের আওয়াজ আসে। কিছু বন্ধুকে বললাম যাদের মোবাইল আছে, তোমরা এমন কর না। ইহা

গোনাহের কাজ। তারা বলে, কি করব মোবাইলে গান ছাড়া রিংটোন থাকে না, তাই গানই জরুরী হয়ে পড়েছে। আমি বললাম, তালাশ করে মোবাইলে সাধারণত যে রিংটোন হয়ে থাকে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন। টেলিফোনের পরিচিত যে ঘন্টা তা ব্যবহার করুন। এছাড়া উঁচু-নিচু আওয়াজের সকল শব্দ হারাম।

মসজিদেও মিউজিক

কখনো কখনো কিছু মানুষের মোবাইল বেজে উঠে নামায নষ্ট করে দেয়। মসজিদে মিউজিক বাজানোর কারণে গোনাহগার হয়। তারপর বলে, আমি কি করব? বর্তমানে মোবাইলে তো ইহাই এসে থাকে। গান লোডকারীরা খারাপ নিয়তের কারণে যদি ও তাতে গান ভরেছে, তারপর ও তাতে ভালো আওয়াজ ভরা সম্ভব। এক্ষেত্রে মুফতী সাহেবরা উত্তম ফয়সালা প্রদান করবেন। কিছু লোক কোরআনের তিলাওয়াত রিংটুন হিসেবে দিয়ে থাকে। কিন্তু মুফতী সাহেবরা উহা থেকে কেন নিষেধ করেন? তারা বলেন, তখন তিলাওয়াতের সময় নয়। ঘন্টার কাজে কোরআনের তিলাওয়াত ব্যবহার করা, তার শানের খেলাপ। তাই যারা তিলাওয়াত ভরে নেয় তা ঠিক নয়। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে সতর্কতামূলক জিনিস কোনটি? টেলিফোনের ঘন্টা, অথবা চড়ুই পাখির আওয়াজ হতে পারে। সবচেয়ে উত্তম হবে السلام عليكم শব্দ ভরে নেওয়া। কেননা কোরআনে এসেছে السلام عليكم শব্দটি গঠন করা হয়েছে সাক্ষাতের জন্য। অন্যকে আকর্ষণ করার জন্য। কারো দরজায় আসলে وتُسَلِّمُو اعلى اُهلِها (ঘরের লোকদের সালাম দাও) যেহেতু ইহা কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত, তাই আপনি السلام عليكم শব্দটি রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করেন, তবে ইহা ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক হয়ে যাবে। তাই হয়ত ঘন্টার আওয়াজ ব্যবহার করবেন অথবা السلام عليكم শব্দটি মোবাইলে ভরে নিবেন। কেউ কেউ الله الله শব্দটি রিংটোন ব্যবহার করে, এই পদ্ধতি ও সঠিক। কেননা আমরা তো চাই যে আল্লাহর নাম চর্তুদিক থেকে শুনি। আমাদের স্মরণে তো কেবল আল্লাহ তা'আলাই আছেন। এই বিষয়টি এমন যেমন জুলাইখা ঘরের প্রতিটি বস্তুর

নাম রেখেছিল ইউসুফ। তার সামনে কোন বস্তু উপস্থিত করার পর যদি ঐ বস্তুর নাম জুলাইখা বলে যেত তবে সে ইউসুফ বলে দিত। মুমিনের ভালোবাসা যেহেতু আল্লাহর সাথে তার সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই উদ্দেশ্য। আর এসকল বিষয় কিয়ামতে নিকটের আলামত।

কিয়ামতের নিকটবর্তী নির্দশন

নবী করীম সা. ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতে নিকটবর্তী সময়ে প্রত্যেক বান্দার কানে গায়িকার গানের আওয়াজ পৌঁছবে। আমরা কখনো কখনো ভীষণ পেরেশানীতে পড়ে কাউকে টেলিফোন দিলে ওয়াইটিংয়ে থাকে আর বলা হয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আর গানের আওয়াজ আসতে থাকে। কত বড় বিপদ! এখানেও মিউজিক। এখন বান্দাও অপারগ হয়ে নিষেধ করতে পারে না। দ্বিতীয়বার ফোন দিতে হয়। তাই কানে নেওয়ার সময় একটু ফোনটা দূরে রাখবেন। এছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে যেহেতু শতভাগ গান, আর গান হারাম, তাই তা থেকে বাঁচা আবশ্যক। অতএব কানের خشوع (বিনয়) হল মানুষ হারাম আওয়াজ, হারাম কথা থেকে কান বাচিয়ে রাখবে। অবাস্তব ধাধা ও শুনবে না। মিথ্যা কৌতুক, মিথ্যা কথা সব এর মধ্যে শামিল। তাই মিথ্যা ধাধা, কৌতুক, মিথ্যা কথা শোনবে না। কেননা এগুলো خشوع(বিনয়ের) এর প্রতিবন্ধক এবং কারো চোগোলখোরী শোনা থেকে বিরত থাকবে।

যবানের খুশু خشوع (বা বিনয়)

যবানের حشوع বা বিনয় হল কাউকে কষ্ট না দেওয়া। কেউ শক্ত কথা বলে অন্যকে কষ্ট দেয়। আল্লাহর শান তাদের বুঝেই আসে না। যদি মুখের শব্দ সুন্দর ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী হয় তাহলে অন্য মানুষ আপনাকে বন্ধু মনে করবে। আর যদি সুন্দরভাবে কথা বলতে না পারে মানুষ আপনাকে শত্রু মনে করবে। এ কারণে সুন্দর ভাষা ব্যবহার করা উচিত। মানুষ গীবত করতে পারে না, মিথ্যা বলতে পারে না, চোগোলখোরি করতে পারে না।

যবানের সঠিক ব্যবহার করাকে যবানের خشوع (বিনয়) বলে। যে ব্যক্তি যবানের সঠিক ব্যবহার করে, কোরআন তিলাওয়াত করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসেন। মনযোগ দিয়ে শুনুন হাদীসে এসেছে, যে বান্দা কোরআন তিলাওয়াত করে, তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র হযরত জিবরাঈল আ. এর কোরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য হয়েছে। বাকী ফেরেশতারা কোরআন পাঠ করতে পারে না। তারা আল্লাহর যিকির করে।

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝١٩ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

আর যারা আল্লাহর কাছে রয়েছে, তারা তার ইবাদতের ক্ষেত্রে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা দিবা-নিশি। অক্লান্তভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও যিকির করে তাদের কোন ক্লান্তি নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কোরআন দান করেছেন। ফেরেশতাদের মধ্যে শুধু জিবরাঈল আ. কোরআন তিলাওয়াত করতে পারে। এই সৌভাগ্য তারই হয়েছে। তিনি নবী কারীম সা. কে পড়ে শুনিয়েছেন এবং তার সাথে দাওর ও করেছেন। এই কারণে যে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। কিন্তু কোরআন দেখলে তার কাছে ভালো লাগে। কোন বান্দা কোরআন তিলাওয়াত করলে তৎক্ষাণাৎ সেখানে ফেরেশতা অবতীর্ণ হতে শুরু করে এবং বলে, পড়তে তো পারি না, তবে আল্লাহর সত্য কালাম শোনে নেয়। অতএব ফেরেশতারা সেখানে জমা হয়ে যায়। এমনকি লাইন হতে হতে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, অনেক সময় মানুষ স্থির ও প্রশান্তিতে কোরআন তিলাওয়াত করে, তখন ফেরেশতা কারী সাহেবের একেবারে নিকটবর্তী হয়ে যায়। এমনকি তার মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে নেয়। এক হাদিসে রয়েছে ফেরেশতা এতই আগ্রহী হয়ে থাকে যে, আল্লাহর কালাম শোনার আগ্রহ নিয়ে ক্বারী সাহেবের মুখের সাথে মুখ মিলিয়ে নেয়।

মুখ থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরণ

ইমাম আসেম কুফী রহ. একজন বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। মদিনায় কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে তার মুখ থেকে সুগন্ধি ছড়াত। মানুষ আশ্চর্য হয়ে যেত। যে জানা নেই কারী সাহেব কি মেশকে আম্বর ব্যবহার করেন অথবা অন্য কোন জিনিস ব্যবহার করেন। যে কারণে তার মুখ হতে এত সুগন্ধি আসত যে মানুষ হয়রান হয়ে পড়ত। একদিন এক খাদেম প্রশ্ন করল হযরত! আপনি কি জিনিস ব্যবহার করেন? আপনার মুখ থেকে এমন সুগন্ধি বের হয়, যা আমরা আর কখনো পাইনি। কারী সাহেব বলল, মাশাআল্লাহ! আমি তো মুখে কিছুই ব্যবহার করি না, তাহলে এই সুগন্ধি কোথায় থেকে আসে? তারপর তিনি নিজের ঘটনা শোনালেন। তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে নবী কারীম সা. এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হই। হুযুর সা. বলেন, হে আসেম! তুমি তো আল্লাহর কোরআন খুব সুন্দরভাবে পাঠ কর। এদিকে আস! আমি তোমার ঠোঁটে চুমু দেই। যখন নবী কারীম সা. আমার ঠোঁটে চুমু দিলেন। তখন থেকে আমার মুখ দিয়ে সুগন্ধি বের হয়। অতএব যবানের খুশু (বিনয়) হল, গীবত, মিথ্যা ও চোখলখোরী থেকে বেঁচে থাকা। যবান দ্বারা আল্লাহর কোরআন, যিকির, কল্যাণকর কথা, উপদেশমূলক কথা বলতে থাকবে।

অন্তরের খুশু বা বিনয়

যবানের নীচে হল অন্তর। অন্তরের খুশু বা বিনয় হল, অন্তরে শুধুমাত্র আল্লাহর ভালোবাসাই বিদ্যমান থাকা। মাখলুকের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের ভালোবাসা না থাকা। কখনো কখনো অন্তরে লোভ ও আশা জন্মে যে অমুক বস্তুটি আমার অর্জন হয়ে যাবে। ইহা অন্তরে খুশু বা বিনয় হতে পারে না। অন্তরের বিনয় হল, অন্তরকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য খালি করা। মুফাসসীরীনে কেরাম একটি আশ্চার্য রহস্য লিখেছেন। তারা বলেন, বিনয়ামিনের গম থেকে পিয়ালা বের করে বিনয়ামীন আ. কে হযরত ইউসুফ আ. এর সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরের পেয়ালা আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণ করে বের করা হয়, তবে বান্দা

আল্লাহর সাথে মিলন হয়। ইহা আমাদের অন্তরের পেয়ালা। আমরা ইহাকে স্বর্ণ দ্বারা বানাব। যেমন মুফাসসীরীনে কেরাম লিখেন যে, হযরত ইউসুফ আ. এর পেয়ালা স্বর্ণের ছিল। মাশাআল্লাহ! আমরা ও আমাদের অন্তরের পেয়ালা স্বর্ণের বানিয়ে নিব যাতে তা শরীর থেকে বের হয়ে আল্লাহর সান্যিধ্যে চলে যায় এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ ফরমান,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এ আয়াতে জান ও মাল খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। কোথাও দিল বা অন্তরের আলোচনা আসেনি। কেননা দিল হল আল্লাহর ঘর। সাধারণত মানুষ প্রথমে ঘর ক্রয় করে, বাকী আসবাবপত্র পরে ক্রয় করে। সর্বপ্রথম বান্দার ঘর বানানো উচিত। এখান থেকে একটি রহস্য উদঘাটন হয় যে ভাই এখানে দিলের আলোচনা এজন্য করা হয়নি, যে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের থেকে তাদের দিল ও মন বা ধনসম্পদ কিনে নিয়েছেন। আর এখানে নফস ও মালের আলোচনা এসেছে দিলের আলোচনা আসেনি। মুফাসসীরীনে কেরাম এর উত্তরে লিখেন, যে মানুষের কাছে তিনটি জিনিস ছিল। দিল, নফস ও মাল। কিন্তু এই তিনটি থেকে দিলকে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য একক করে নিয়েছেন। আর শরীয়ত ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রির অনুমতি প্রদান করে না, সুতরাং দিল যেহেতু ওয়াকফের সম্পত্তি, আর তা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে তাই তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। দিল ছাড়া বাকী আছে দুটি জিনিস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছি। তাই দিল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। এটি শুধুমাত্র ওয়াকফের সম্পত্তি।

পেটের খুশু বা বিনয়

অন্তরের নীচে হল পেট। পেটের খুশু হল, মানুষ পেটে হারাম ও সন্দেহপূর্ণ লোকমা প্রবেশ করাবে না। আর সবচেয়ে সহজ বিষয় হল মানুষ তার ঘরে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করবে, বাহিরের খাবার খেলে পেটে হারাম প্রবেশ

করা শুরু হবে। একারণে হোটেলওয়ালারা নিজেরাও হোটেলের খাবার ভক্ষণ করে না। কিছু যুবকের হোটলে আহার করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বস্তু ও পেটে ঢুকতে পারে। মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অবৈধ সম্পদ কামাই করতে পারে না। ঘুষের মাল চক্রান্তের মাল, ধোঁকার মাল, সুদের মাল এই সবকিছু হারাম। এগুলো থেকে পেটকে বাঁচাতে হবে। অল্প আহার করবে তবে তা হালাল হতে হবে। একারণে সিদকে মাকাল (সত্যকথা) রিযকে হালাল (বৈধ রিযিক) রিযিক ও সুলুকের(আত্মশুদ্ধি)পথে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে তার দুআ কবুল হয় না। কাবা শরীফ ঝড়িয়ে ধরে দু'আ করলে ও আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন না। অতএব পেটের খুশু (বিনয়) হল হালাল ভক্ষণ করবে, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে।

লজ্জাস্থানের খুশু বিনয়

পেটের নীচে রয়েছে লজ্জাস্থান। মানুষকে লজ্জাস্থানের গোনাহ থেকে ও বাঁচতে হবে। একারণে নবী কারীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে দুটি জিনিসের যামানত দিবে, প্রথমটি হল যা দুই চুয়ালের মাঝে রয়েছে অর্থাৎ যবান, যবানকে সঠিক ব্যবহার করবে, আরেকটি হল দুই রানের মধ্যস্থিত লজ্জাস্থান। নবী কারীম সা. বলেন আমি তার জন্য জান্নাতের ঘরের যিম্মাদারি নিয়ে নেব। কোন গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করতে হবে। তওবার দরজা আল্লাহ তা'আলা খোলা রেখেছেন।

এক বদকার মহিলার বাস্তব ও পাক্কা তওবা

বণী ইসরাঈলে খুব সুন্দরী এক বদকার মহিলা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে রুপ ও লাবণ্য দিয়েছেন। সে খারাপির চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। পুরা এলাকার লোকদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। সে বিশাল প্রচুর্যের অধিকারী হয়ে গিয়েছিল। একটি বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে তাতে একটি শাহী আসন বানিয়েছিল। সে পরিপাটি ও সুসজ্জিত হয়ে সম্রাজ্ঞীর

সেই শাহী আসনে সমাসীন হত। তার সাথে পুরা শহরের আমীর উমরারা সম্পর্ক রাখত।

একদা মহিলা আসনে বসছিল, ইত্যবসরে তার পাশ দিয়ে মহল্লার সৎ ও ইবাদতগোযার এক যুবক অতিক্রম করলে মহিলার উপর যুবকের দৃষ্টি পড়ে যায়।

মহিলার আকৃতি তার অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করে ফেলল। যুবক সামনে চলে গেলেও তার অন্তর মহিলা কাছে রয়ে গেল। মোরাকাবা, যিকির আযকার, তাছবীহ ইত্যাদিতে কিছুতেই তার অন্তর বসে না। সে রোযা রাখতে শুরু করল। তারপরও মহিলার ফিকির তার অন্তর থেকে বের হচ্ছে না, নিজের উপর কষ্ট আরোপ করল। কয়েকদিন নিজেকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখল, তারপরও মহিলার ফিকির অন্তর থেকে বের হয়নি। পরিশেষে সে ভাবল যে, যেহেতু আমার অন্তর থেকে মহিলার চিন্তা বেরই হচ্ছে না তাই আমাকে তার কাছে যেতেই হবে। সে তার কাছে যে সকল আসবাস পত্র ছিল সেগুলো বিক্রি করে এই পরিমাণ টাকা যোগাড় করল যে পরিমাণ টাকা হলে বদকার মহিলা তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়। যুবক মহিলাকে টাকা দিয়ে আসলে মহিলার পাশে বসে পড়ল। তার সাথে কথোপোকথন শুরু করল। কথোপোকথনের মাঝে হঠাৎ তার অন্তরে এই খিয়াল আসল যে, আমি এত বছর নেককার হয়ে জীবন অতিবাহিত করলাম আর আজ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে বসা অবস্থায় দেখছেন। এই চিন্তা আসতেই তার অন্তরে আল্লাহর ভয় প্রভাব বিস্তার করল। ফলে যুবক কাঁপতে লাগল। মহিলা তাকে জিজ্ঞাস করল তুমি কাঁপছ কেন? তোমার চেহারা কেন বিবর্ণ হয়ে গেল? যুবক বলল, আমার অবস্থা ভালো নয়। মহিলা বলল, যে উদ্দেশ্যে এসেছো তা পূর্ণ করে চলে যাও। যুবক বলল না। মহিলা আশ্চর্য হয়ে গেল, যে জীবনে কোন এমন পুরুষকে পায়নি যে আমার নিকটে বসে খারাপ উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে চলে গেছে। এটি কেমন যুবক? কিন্তু সে যুবক বলল, আমি চলে যাচ্ছি। মহিলা তাকে বলল, তুমি কে? যুবক বলল, আমার নাম এই। আমি অমুক বস্তিতে থাকি। আমার অন্তরে এই চিন্তা আসলো যে, আমি

এত বছর ধরে নামাজের মুসল্লায় বসে জীবন কাটালাম, আর আজ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাথে আমাকে বসা দেখছেন। যুবকের চোখে পানি চলে আসলো, এবং সে চিৎকার করতে শুরু করল। যুবকের কিছুক্ষণের সান্যিধ্যের বরকতে মহিলার মাঝে প্রতিক্রীয়া সৃষ্টি হল।

মহিলা অন্তরে এই খিয়াল আসল যে, এই অবিবাহিত যুবক আল্লাহকে কত ভয় করে যে, গোনাহের কাজও করেনি, অথচ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর আমি সবসময় গোনাহে লিপ্ত থাকি, অথচ আল্লাহকে সামান্য ও ভয় করি না। তার অন্তরে লজ্জা ও অনুশোচনা সৃষ্টি হল, যে আমি কি করছি? অন্তরে এই খিয়াল আসল যে হযরত মূসা আ. কে গিয়ে এই প্রশ্ন করব যে আমার তওবার কোন সুযোগ আছে কিনা। সে ঘর থেকে বের হল। মহল্লার সকলেই তাকে চিনত। মহিলা হযরত মূসা আ. এর কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে নসীহত করছেন। মহিলা একজন লোক মারফত হযরত মূসা আ. এর কাছে সংবাদ পাঠাল যে, অমুক মহিলা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। সংবাদদাতা ছিল বোকা। সংবাদ দেওয়ার তরীকাই সে জানে না। আল্লাহর এই বান্দা সোজা গিয়ে হযরত মূসা আ. কে বলে দিল হযরত! অমুক মহিলা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। হযরত মূসা আ. রাগ করলেন, যে মানুষ কি মনে করবে, যে এই মহিলা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে, তার সাথে এই মহিলার কি সম্পর্ক? হযরত মূসা আ. সংবাদদাতাকে বললেন, মহিলাকে চলে যেতে বল। তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই না। সংবাদদাতা গিয়ে মহিলাকে বলল যে, হযরত মূসা আ. তোমার উপর ভীষণ রাগ করেছেন। মহিলা ভয় পেয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, আল্লাহর নবীও আমার সাথে কথা বলতে চায় না।এখন তো আমার কোন উপায় নেই। নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসল। বুঝতে পারছিল না এখন সে কি করবে। সে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। মহিলা তার কোন এক মুরব্বীর কাছে শুনেছিল যে, আল্লাহকে খুশি করতে চাইলে সেজদা করবে। যেহেতু তার কোন উপায় বাকী ছিল না, তাই ঘরের দরজা বন্ধ করে সিজদায় গিয়ে বলতে লাগল

میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا + میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার সামনে মাথা অবনত করছি।
হে আল্লাহ, তোমাকে ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

পুরা পৃথিবীতে নাজাতের কোন রাস্তা তার নযরে পড়ছিল না। তওবার পদ্ধতি শিখার জন্য হযরত মূসা আ. এর কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলেন। মহিলা চিন্তা করল যে আমি দু'আ করতেই থাকব, এবং রোনাযারী করতেই থাকব। মহিলা সংকল্প করেছিল যে, আজ থেকে আমি আর খারাপ কাজ করব না। ইত্যবসরে কেউ তার দরজায় নক করলে তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন যে, জানা নেই দরজায় কে আঘাত করছে। মহিলা ভাবল আজও হয়ত কোন আগন্তুক (খদ্দর) এসেছে। মহিলা দরজা না খোলার ইচ্ছা করল। কিন্তু দরজায় অনবরত নক করা হচ্ছে। মহিলা ভয় পেয়ে গেল, যে যদি দরজা খুলি তাহলে হয়ত কোন বদকার বন্দা আমাকে খারাপ কাজে বাধ্য করবে। সে আল্লাহর কাছে রোনাযারী করল যে, হে আল্লাহ, আমি দরজা খুলতে চাচ্ছি না, যতই ক্ষমা চাচ্ছিল আগন্তুক দরজায় আরো বেশী আঘাত করছিল। বাধ্য হয়ে পরিশেষে দরজা খুললে দরজায় হযরত মূসা আ. কে দেখতে পেল। মহিলা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল হযরত আপনি এখানে এসেছেন কেন? হযরত মূসা আ. বললেন, আমি খুৎবা দেওয়ার সময় আমার কাছে তোমার সংবাদ পৌঁছেছে, আমার কাছে খারাপ লেগেছে যে, মানুষ কি মনে করবে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছ। তাই আমি অস্বীকার করে দিয়েছি।

খুৎবা থেকে ফারেগ হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে ওহি আসল, হে আমার প্রিয় পয়গম্বর! আপনি তাকে তিরষ্কার করেছেন। এই অহী আসতেই আমি তোমার কাছে চলে এসেছি। কারণ তুমি সত্য তওবার নিয়ত করেছো। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি এতই খুশি যে আমাকে নসীহত করেছেন যে, তুমি তাকে কেন ফিরিয়ে দিয়েছো। হযরত মূসা আ. তাকে তার তওবা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার সংবাদ প্রদান করে চলে আসলেন। মহিলা আল্লাহর কাছে রোনাযারী করে বলল, হে আল্লাহ, আমি বড় গোনাহগার আর আপনি বড় ক্ষমাশীল। যার দরজায় বদকাররা আসত

আজ তওবার কারণে তার দরজায় যামানার বুযূর্গ ও পয়গম্বর এসেছে। হে আল্লাহ, আপনার শান কত উঁচু! মহিলা খারাপ কর্ম পরিহার করার দৃঢ় সংকল্প করল।

আল্লাহর শান দেখুন, একরাত অতিবাহিত হওয়ার পর তার অন্তরে এই খিয়াল আসল যে, আমি সত্তাগতভাবে মহিলা। আবার একাকী একটি ঘরে থাকি। আমার একজন সেবিকা আছে। আমি খারাপ কর্ম পরিহার করার নিয়ত করলেও যারা আমার সাথে অপকর্ম করত তারা আমাকে আমার সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে দিবে না। তাই উত্তম হল আমি এই স্থান ছেড়ে চলে যাই। সে সিদ্ধান্ত করে নিল যে, আমি এই স্থান ছেড়ে চলে যাব। সে একটি সাদা কাপড় পরিধান করল, যাতে কেউ তার কাপড় ও সৌন্দর্য দেখে চিনতে না পারে। মহিলা ভাবল আমি সত্তাগত মহিলা তাই কোথায় যাব? তাই মহিলা চিন্তা করল যে আমি ঐ নেককার যুবকের কাছে চলে যাব। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। আমি তার খাদেমা হয়ে যাব। হয়ত সে আমাকে বিবাহও করে নিতে পারে।

মহিলা যুবকের এলাকার দিকে রওয়ানা হল। তালাশ করে যুবকের ঘরে উপস্থিত হল। ঘরওয়ালাদেরকে বলল, যে, অমুক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। পরিবারের লোকেরা বলল, সে ইবাদত ও যিকিরে ব্যস্ত। এতটার সময় বের হবে, তাই তুমি অপেক্ষা কর। সে অপেক্ষায় বসে রইল। হঠাৎ যুবক বের হয়ে আসলে তার দৃষ্টি মহিলার দিকে পড়লে তার মনে পড়ে গেল, যে আমি নামাযের মুসল্লা ছেড়ে তার সাথে খাটে বসেছিলাম। যুবকের অন্তরে ভয় চলে আসল, যে সে পুনরায় আমার ঈমান খারাপ করার জন্য চলে আসছে না তো? আমি বহু কষ্ট মোজাহাদার পর তার কল্পনা স্মৃতি থেকে বের করেছি। যুবকের উপর এতই ভয়ের সঞ্চার হল যে, সে পড়ে গেল, তার আত্মা বের হয়ে গেল। তার মৃত্যুতে পরিবারের লোকেরা ব্যথিত হল, মহিলাও ভীষণ কষ্ট পেল।

তিন দিন পর মহিলা ঘরের লোকদের কাছে উদ্দেশ্য খুলে বলল। তারা বলল সেতো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তবে তার একজন ভাই আছে তুমি ভাল মনে করলে আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি। সে তোমাকে বিবাহ

করতে চাইলে তুমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। মহিলা বলল, ঠিক আছে। যুবকের ভাইয়ের সাথে আলোচনা করা হল সে সম্মত হল, যে প্রথমে সে এরকম ছিল, কিন্তু যেহেতু তওবা করে নিয়েছে, তাই বিবাহ করা যায়। যুবকের ভায়ের সাথে মহিলার বিবাহ হল। আল্লাহ তা'আলা মহিলাকে সাতটি সন্তান দান করেছেন। সাত সন্তানই ছিলেন বণী ঈসরাঈলের বুযূর্গদের মধ্যে থেকে অন্যতম। এমন বদকার মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা তওবার বদৌলতে সাতজন অলীর মা বানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা কতইনা দয়ালু।

হাত ও পায়ের খুশু বিনয়

লজ্জাস্থানের নীচে রয়েছে মানুষের হাত ও পা। হাত ও পা দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেওয়া। এবং গোনাহের কাজ না করা হল হাত পায়ের খুশু। বর্তমান যুবকরা ঘরে শান্তি পায় না। বাইরে গিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। মা-বাবা থেকে লুকিয়ে ক্যাফে চলে যায়। কেউ ইন্টারনেট ক্যাফে যায়, আবার কেউ এদিক সেদিক চলে যায়। গেইম খেলে। ভিডিও গেইমের জায়গায় বদকারদের আড্ডা থাকে। কোন ভদ্র মানুষ এক সেকেন্ডের জন্য ও সেখানে যেতে পারে না। হাত ও পায়ের খুশু হল মানুষ এসকল স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে। মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খুশু বা বিনয়ের এসকল নিদর্শন প্রকাশ পেলে, তাকে বলে বিনয়ী মানুষ। উলামায়ে কেরামের মাঝে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি দিয়ে থাকেন। তাদের মাঝে এসকল নিয়ামত পাওয়া যায়।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا

বান্দাদের মধ্য থেকে উলামায়ে কেরামই আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে ভয় করে থাকে।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

সপ্তম শর্ত

দান-সদকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মাগফিরাতের সপ্তম শর্ত

এটি বাইশ পারার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াত, যাতে আল্লাহ তায়ালা মুমিন নর-নারীকে দশটি শর্তের উপর জান্নাত দেয়ার অঙ্গিকার করেছেন। তন্মধ্যে সাত নাম্বার শর্ত হচ্ছে সদকাকারি পুরুষ ও সদকাকারি মহিলা।

সম্পদ সদকা করা

সদকার ব্যপারে কিছু কথা বুঝে নিন। একটা তো সম্পদ সদকা করা যেমন কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু খরছ না করা পর্যন্ত নেকি অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমরা নেকীর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারবে না যে যাবৎ না

তোমরা তোমাদের অধিক পছন্দনিয় এবং প্রিয় বস্তু খরচ না করবে। কারণ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা এটা মানুষকে বিভিন্ন বালা মসিবত থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। আর যে ব্যক্তি দান করে ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দু'য়া করে। নবী কারীম সা. এক হাদীসে শপথ করে বলেছেন যে, ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করবে, তার এই দান করার কারণে সম্পদ কমবে না বরং বাড়বে। এই কথা তো নবী কারীম সা. শপথ করে বলেছেন, আল্লাহু আকবার (তবে তো এর গুরুত্ব অনেক)।

সদকায়ে জারিয়া

প্রিয় শ্রোতা! আমাদের তো এমন কাজ করা উচিত যা সদকায়ে জারিয়া হবে। আর সদকায়ে জারিয়া এমন সদকাকে বলা হয় যার প্রতিদান মৃত্যুর পরও চালু থাকবে। উলামায়ে কেরাম লিখেন যে এ ধরনের সদকা হচ্ছে সাতটি। যেমন কাউকে ইলম শিক্ষা দেয়া। নিজ সন্তানদের মাদরাসায় পড়ানো। অথবা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদেরকে পড়ানোর সুযোগ করে দেয়া। নদী বানানো, কুপ খনন করা, গাছ লাগানো, মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে কুরআন শরীফ রাখা, অথবা নেক সন্তান রেখে যাওয়া। এগুলো হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া।

সদকা শুধু ধন সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়

অধিকাংশ মহিলাদের মস্তিষ্কে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আমাদের তো সদকা করার মত সামর্থ্য নেই। তাদের তো মনে রাখা উচিত যে, শুধুমাত্র সম্পদ ব্যয় করার নামই সদকা নয়। বরং এটা একটি ভুল ধারণা। সংশোধন করা উচিত। সম্পদ খরচ করা এটিও একটি সদকা। এ ছাড়া ও আরো অনেক সদকার বিষয় রয়েছে যেগুলোর জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয় না। আর এ ধরনের কাজ তো মহিলারাও করতে পারে। যেহেতু মহিলা সদকা করলে স্বামীর মাল থেকেই করবে তাই তার অনুমতির প্রয়োজন এবং তার আস্থাভাজন হতে হবে। অনুমতি ছাড়া তো

মহিলা সদকা করতে পারবে না। হ্যাঁ তবে যদি সে নিশ্চিতভাবে জানে যে স্বামী এতে খুশী হবে তাহলে দান করা যায়। কিন্তু যে কাজে সম্পদের প্রয়োজন পড়ে না তাতো বিবাহিত, অবিবাহিত, যুবতি, বৃদ্ধা প্রতিটি নারীই করতে পারে। সুতরাং আজ এর সামান্য আলোচনা জেনে নিন।

দেহের প্রতিটি জোড়ার সদকা

হাদীছে পাকে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মানব দেহে গ্রন্থি (জোড়া) আছে, আর তার উচিত প্রতিটি গ্রন্থির জন্য প্রত্যেক দিন সদকা করা। কারণ গ্রন্থির সঠিকভাবে চলাচল করার বিনিময়ে তার উপর সদকা ওয়াজিব হয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী সা. ! দেহে তো তিনশতের চেয়েও বেশী গ্রন্থি রয়েছে। সুতরাং আমাদের সদকা করার উপায় উপকরণ নেই? তখন নবী কারীম সা. তাদেরকে বুঝালেন যে, দেখো যবান দিয়ে سبحان الله পড়া الحمد لله বলা এবং لاإله إلاالله বলা এগুলো সদকার অন্তর্ভুক্ত। এবং দিনের বেলা ১০টা বাজে চাশতের নামায দুই রাকা'ত পড়া এটাও মানুষের জন্য একটি সদকা। আর চাশতের এই দুই রাকাত নামায পড়ার মাধ্যমে কেমন যেন বান্দা সমস্ত জোড়ার সদকা আদায় করে ফেলল। এখন কোন মহিলাই বা বলবে যে আমি তো চাশতের দু-চার রাকাত নামায পড়তে পারি না। প্রত্যেক মহিলাই পড়তে পারবে। সুতরাং যখন দিন নয়টা-দশটা বাজে বাচ্চারা স্কুলে চলে যায়, স্বামী অফিসে চলে যায়, এবং মহিলারাও ঘরের যাবতীয় কাজ থেকে অবসর হয়ে যায় তখন টিভির সামনে গান শুনা অথবা অযথা গল্প গুজবে কাটানোর পরিবের্তে ওযু করে দু-চার রাকাত নামায আদায় করে তবে তার জন্য এতে দুটি ফায়দা রয়েছে।

(১) এই নামায আদায় করার মাধ্যমে মানব দেহে যতগুলো গ্রন্থি সচল রয়েছে সবগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় হয়ে যায়, এবং তার সদকা হয়ে যায়। আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কত বড় দয়া অনুকম্পা যে তিনি গ্রন্থিসমূহে কোন ধরনের রোগ ব্যাধি দেন নি। আল্লাহ তা'লার কত বড় মেহেরবানি যে আমাদের দেহের গ্রন্থিসমূহ সঠিকভাবে চলাচল করছে এবং

উঠা বসা করি। আর বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে দেখুন দাঁড়ালে বসতে পারে না, বসলে তো দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং আমাদের গ্রন্থিসমূহ যেহেতু আল্লাহ পাক ঠিক রেখেছেন তাই আমাদের উপর তার শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। অবশেষে বুঝা গেল যে, চাশতের দু-চার রাকাত পড়ার মাধ্যমে দেহের সমস্ত জোড়ার সদকা আদায় হয়ে যায়।

(২) এই নামায পড়লে আল্লাহ তা'আলা রিযিকের মধ্যে বরকত দিবেন। এবার বলুন তো! কোন মহিলা এমন রয়েছে যার রিযকের মধ্যে বরকতের প্রয়োজন নেই? প্রত্যেক মহিলার রিযকের মধ্যে বরকত প্রয়োজন। সর্বশেষ এই নামায থেকে দুটি উপকার পাওয়া গেল। এই জন্য এটি পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

মুচকি হাসি দেওয়াও সদকার অন্তর্ভুক্ত

নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন যখন এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে মুচকি হেসে পরস্পরে সাক্ষাৎ করা এটিও একটি সদকা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, পুরুষ পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করলে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করবে, মহিলা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করলে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, খোলা চেহারা এক মহিলা অপর মহিলার সাথে সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসা একটি সদকা।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা একটি সদকা

নবী কারীম সা. বলেছেন, প্রত্যেক নেক কাজ করা সদকা। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাও একটি সদকা। বিপদগ্রস্তকে যে শুধু সম্পদ দ্বারাই সাহায্য করতে হয় বিষয়টি এমন নয়, বরং ভালবাসা ও সান্ত্বনা স্বরুপ দু-চারটি কথা বলে দিলেও বিপদগ্রস্তা নারীর অন্তরে প্রশান্তি চলে আসবে। আর আপনার জন্য এই দুই কথা সদকা স্বরুপ হবে। ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো, মেহমানের মেহমানদারি করা ও সদকার অন্তর্ভূক্ত। এখন লক্ষ্য করে দেখেন তো, কত আরামে আমরা সদকার কাজ আঞ্জাম দিতে পেরেছি।

আল্লাহর যিকির একটি সদকা

অপর এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, سبحان الله বলা একটি সদকা। এই কারণে আমাদের কথায় কথায় سبحان الله বলা উচিত, যে আমাদের উপর আল্লাহ তা'লার এটা একটা অনুগ্রহ। যেমন سبحان الله আমার মেয়ে এই কাজ করেছে। سبحان الله আমার ছেলে এই কাজ করেছে। সুতরাং سبحان الله শব্দটি অধিকহারে আমাদের ব্যবহার করা উচিত। তাহলে এমনিতেই সদকার ছওয়াব পেয়ে যাব। এমনিভাবে الحمد لله বলা একটি সদকা। এখন কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে এটা কিভাবে? তখন আপনি বলবেন যে, الحمد لله আল্লাহ তা'য়ালার অনেক অনুগ্রহ আমাদের উপর রয়েছে। সুতরাং الحمد لله শব্দ বলার দ্বারা আপনি সদকার ছওয়াব পেয়ে যাবেন। এমনিভাবে কোন বিষয়ে الله اكبر বলা এবং لا اله إلا الله বসে বসে পড়া ও সদকার অর্ন্তভূক্ত। আপনি তো কত কাজ করেন যার সাথে উক্ত যিকিরগুলো পড়তে পারেন। যেমন খানা পাক করার সময় আপনি ৩ বার لا اله إلا الله বলবেন ৩ বার সদকা করার ছওয়াব পাবেন।

সৎকাজের আদেশ একটি সদকা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, সৎকাজের আদেশও সদকা সমতুল্য। অর্থাৎ যারা নামাজের নির্দেশ দেয়, নিজ স্বামীকে মহব্বতের সাথে ভাল কাজের আদেশ দেয়। এমনিভাবে ভাই বোন, ছোট- বড় সবাইকে সৎকাজের আদেশ দেয়া। যেমন বাচ্চা পিতাকে বলল, আব্বু আপনি তো নামায পড়েননি। আমি আপনার জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করে দেই আপনি ওযু করে নামায পড়ে নিন। সুতরাং এই আমর বিল মারুফও একটি সদকা। এবং নাহি আনিল মুনকার তথা অসৎকাজের নিষেধও একটি সদকা। যেমন কেউ তার মেয়েকে বলল, পর্দাবিহীন চলা ফেরা করো না। এভাবে ফোনে কথা বলবে না, এবং টিভি দেখবে না। অসৎকাজ থেকে হেকমতের সাথে নিষেধ করাও একটি সদকা।

স্বামী- স্ত্রীর পরস্পর মিলনও একটি সদকা

এখন আমি অন্য একটি বিষয় আলোচনা করব শুধু বিবাহিত মহিলাদের জন্য। তাহল নবী কারীম সা. বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলা-মেশা করাও একটি সদকা। সাহাবায়ে কেরাম তা শুনে হতভম্ভ হয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী, সা. আমরা তো আমাদের জরুরত পূরা করা এবং খাহেশাত মিটানোর জন্য মিলন করি। সুতরাং এটিও কি সদকার অন্তর্ভুক্ত? তখন নবী কারীম সা. বললেন, বলতো দেখি! তোমাদের কেউ যদি যিনা করে তবে কি সে এর শাস্তি পাবে না? তখন সাহাবারা বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই পাবে। তখন রাসূল সা. বললেন, ঠিক তেমনিভাবে যখন কেউ হালাল পন্থায় এমন কাজ করে তখনও তার প্রতিদান পাওয়া যায়। এই কারণেই স্বামী- স্ত্রী উভয়ে একে অপরকে দেখে মুচকি হাসা, বসে কথা বলা, একে অপরের পাশে বসা, একে অপরের মুখে খাবার তুলে দেওয়া এবং পরস্পর মিলিত হওয়া সবগুলো সদকার অন্তর্ভুক্ত। سبحان الله আল্লাহ তা'আলা মুমিনের জন্য ছওয়াব কামায়ের পথকে কত সহজ করে দিয়েছেন।

এই সমস্ত সদকা আখেরাতে কি কাজে আসবে?

হযরত আয়েশা রা. একদা কান্না করছিলেন। তখন নবী কারীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন ওহে হুমাইরা, তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতাকে স্বরণ করে কাঁদতেছি। পুনরায় বললেন, ওহে আল্লাহর নবী, ক্বিয়ামতের দিন তো প্রত্যেক নবী তার পরিবার পরিজনকে ভুলে যাবে? অর্থাৎ সেই দিন তো আমার কথা আপনার স্বরণ থাকবে না। সুতরাং গভিরভাবে লক্ষ্য করুন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর মত মহিলার কি পরিমাণ ভয় ছিল ঐ দিনের ব্যপারে। তিনি তো এমন ছিলেন যার কোলে নবী কারীম সা. মৃত্যুও সুধাপান করেছেন। যার আচলে ওহী অবতির্ণ হয়েছিল, যার পবিত্রতার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন। যার কাছে হযরত জিবরাঈল আ. এর পক্ষ থেকে সালাম প্রেরিত হত। আল্লাহু আকবার! তার মত নারী ক্বিয়ামত দিবসের ভয়ে কাঁদে অথচ আমি আপনি কোথায়?

অত:পর আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর নবী সা., ক্বিয়ামত দিবসে কি আপনি আপনার পরিবার পরিজনের কথা স্বরণ রাখবেন? তখন নবী কারীম সা. উত্তরে বললেন, ওহে হুমায়রা! ক্বিয়ামত দিবসে তো এমন তিনটি স্থান আসবে যেখানে কেউ কাউকে স্বরণ রাখতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করা হল কোন কোন স্থান? তখন রাসূল সা.বললেন,

(১) আমল নামার ফয়সালা করার সময় কারো ডান হাতে আসবে আবার কারো বাম হাতে। তখন মানুষের উপর বিভিন্ন ধরনের ভয় ভিতি সঞ্চার হবে, এমনকি আমিও বলতে পারি না যে আমার আমলনামা কোন হাতে আসবে। অত:পর বললেন, আমলনামা যখন প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে তখন তার ভয়াবহতার কারণে কেউ কাউকে স্বরণ রাখতে পারবে না।

(২) অত:পর বললেন, যে, আয়েশা! যখন দাড়িপাল্লায় আমলনামা তোলা হবে এবং ফায়সালা না হবে যে কার গুনাহের পাল্লা ভারী, আর কার নেকীর পাল্লা ভারী। তখন পর্যন্ত কেউ কাউকে মনে রাখতে পারবে না।

(৩) তৃতীয় স্থানটি হচ্ছে পুলসিরাত অতিক্রম করার সময়। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা পুলসিরাত পার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কাউকে স্বরণ রাখতে পারবে না এবং কেউ সাথে থাকবে না। প্রত্যেকে একা একা পার হতে হবে। এমনকি মহিলার সাথেও না তার স্বামী থাকবে, না তার বাবা, না তার ভাই। মোটকথা কেউ সাথে থাকবে না। বরং তাকে ও একা পার হতে হবে। আহ! সেই দিনটি কতই না ভয়াবহ, ভয়াঙ্কর ও ভীতিপ্রদ হবে। কেউ কাউকে সাহায্য করার সুযোগ থাকা সত্বেও কাছে আসবে না। বরং একা একাই ঐ ঘাটি অতিক্রম করতে হবে।

নেকি কাজে আসবে

একটি উপদেশমূলক কাহিনী শুনুন। মালেক ইবনে দিনার নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। যিনি প্রথমে পুলিশ বাহিনীতে কাজ করতেন, কিন্তু কিছু খারাপ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং মদ পান করতেন। একদা তিনি খুব সুন্দরী একটি বান্দী ক্রয় করলেন যে, তার কাছে খুব প্রিয় ছিল। একপর্যায়ে বান্দীর গর্ভে তার একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নিল। কিন্তু সে তার মার

থেকেও বেশী সুন্দরী ছিল। আর মালেক ইবনে দিনার এই বাচ্চাটিকে খুব আদর সোহাগ করতেন। এবং অধিকাংশ সময় কোলে নিতেন। বাচ্চাটি তার সাথে খেলা ধুলা করত, বিভিন্ন কথা বার্তা বলত। অত:পর বাচ্চাটি দু বছর বয়সে উপনিত হলে তিনি তাকে যখনই কোলে নিয়ে মদ পান করতেন তখনই বাচ্চাটি তার থেকে মদের গ্লাস কেড়ে নিত এবং ছুড়ে মারত। আবার কখনো বাচ্চাটি তার দাড়ি ধরে খেলা করত কিন্তু সে তাকে কিছুই বলত না। কোন রোগের কারণে বাচ্চাটি দু বছর বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করে। ফলে মালেক বিন দীনার খুব কষ্ট পেলেন এবং তার অন্তরে অনেক বড় ধরনের একটি আঘাত লাগে। এমনকি অনেক দিন পর্যন্ত তার মৃত্যুতে ব্যথিত ছিলেন।

একদা তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, কেমন যেন ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে এবং অগ্নিবায়ুর বিকট ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তখনই তিনি একটি বিশালকার সাপ (অজগর) দেখতে পেলেন, মুখ খোলাবস্থায় তার পিছু নিচ্ছে। তখন তিনি এই অবস্থা দেখে বহুত পেরেশান হয়ে গেলেন এবং পালানোর রাস্তা অবলম্বন করলেন। কিন্তু অজগর সাপটিও তার পিছনে পিছনে চলতে ছিল। পথিমধ্যে বৃদ্ধ ও দূর্বল এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বললেন, বাচাও! আমাকে এই বিপদ থেকে বাচাও। অত:পর ঐ বৃদ্ধ বলতে লাগল আমি তো দূর্বল তোমাকে বাচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ! তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি যদি ঐ পাহাড়ে যাও হয়ত মুক্তির কোন পথ পেয়ে যাবে। তিনি পলায়ন করছিলেন আর সাপ তার পিছু নিচ্ছিল, এক পর্যায়ে তিনি পাহাড়ের নিকটবর্তি হলে দেখতে পেলেন যে, সামনে জাহান্নাম! সামান্য একটু অগ্রসর হলে জাহান্নামে পড়ে যাবেন। তখন তিনি তার মোড় পরিবর্তন করে অন্য দিকে দৌড় দিলেন। আর সাপ ও তাকে ছাড়েনি বরং তার পিছনে পিছনে চলতেই ছিল।

এক পর্যায়ে সাপটি পূর্বের তুলনায় আরো নিকটবর্তি হল। তার কাছে মনে হচ্ছিল যে, সাপটি তাকে ধরে খাবারের লোকমা বানিয়ে খেয়ে নিবে। অত:পর পুনরায় ঐ বৃদ্ধেও সাথে দেখা হল। তখন পুনরায় তিনি তাকে বললেন; আমাকে বাঁচাও! তখনও সে বলল, আমিতো দূর্বল, তোমাকে

সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। হ্যাঁ এখন তুমি দ্বিতীয় ঐ পাহাড়টিতে যাও। হয়ত নিজেকে রক্ষা করার মত কিছু পেয়ে যাবে।

এখন তিনি দ্বিতীয় পাহাড়ের দিকে চলছিলেন কিন্তু অজগরটি পূর্বের তুলনায় আরো দ্রুতগতিতে এত নিকটবর্তি হল যে, তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এটা আমাকে গিলে ফেলবে। আর সাপটি এমন উচ্চস্বরে শব্দ করেছিল যে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল, আর এতই বড় ছিল যে, সে ভয়ে অস্থির হয়ে গেছেন। তিনি এখন আরেকটু সামনে অগ্রসর হলেন। তখন দেখতে পেলেন একজন দারোওয়ান ঘোষণা দিচ্ছে ওহে সোনা মনিরা! বের হও। আছ কি এমন কেউ যে এই লোকটির জন্য সুপারিশ করবে। এই কথা বলার পর দরজা খুলে গেল এবং ওখান থেকে লক্ষ লক্ষ বাচ্চারা বের হতে লাগল। তখন তিনি তার দু'বছরের মেয়েটিকে দেখলেন যে, সে হঠাৎ তার সামনে আসছে এবং লাফ দিয়ে অতিদ্রুত নিকটে চলে আসল। অতঃপর স্বীয় হস্ত দ্বারা সাপের দিকে ইশারা করলে তা চলে গেল। তখন সে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে এনে আনন্দিত হলেন এবং তাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে আমার! তুমি এখানে কিভাবে আসলে? তখন মেয়েটি কুরআন কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করল—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

এবং তার হৃদয়ে উক্ত আয়াতটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তখন তিনি ভালো হয়ে গেলেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, মা মনি! এই কাহিনীটি তো আমি বুঝতে পারিনি এর মানে কি?

তখন সে বলল, ঐ ঘরটি হচ্ছে মুসলমানদের ঐ সমস্ত বাচ্চাদের জন্য যারা ছোটবেলায় মারা যায়। তারা সেখানেই লালিত পালিত হয়। যেন কিয়ামতের দিন স্বীয় পিতামাতার সুপারিশ করতে পারে। আর আমি যখন আপনাকে দেখলাম তখন আপনার সুপারিশের জন্য আপনার কোলে চলে আসলাম। মালেক বিন দীনার বললেন, তবে সাপটি আমাকে ধাওয়া করল কেন? তখন বাচ্চাটি বলল, আব্বু! সাপটি হচ্ছে আপনার গুনাহ। গুনাহের

পরিমাণ এত বেশী ছিল যদ্দরুণ সাপটিও এত বড় আকৃতি ধারণ করেছিল। আর এই বৃদ্ধ লোকটি ছিল আপনার নেক আমল। আপনার নেক আমল যদি বেশী হত তবে তা যুবকের আকৃতি ধারণ করে আপনাকে সাপটি থেকে উদ্ধার করত এবং গুনাহ যদি কম হত তাহলে তা ছোট সাপের আকৃতি ধারণ করত। সেই বৃদ্ধ লোকটি আপনাকে বাঁচাতে পারেনি কিন্তু আমার দিকে আসতে বলে বাচার পন্থা বলে দিয়েছেন। ফলে আপনি আমার কাছে আসলেন অতঃপর আমি আপনাকে তা থেকে রক্ষা করলাম।

আব্বুজান! দয়া করে আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করেন এবং তাকে ভয় করেন। স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর তিনি সত্যিকারার্থে খালেছ দিলে তওবা করলেন এবং অত্যন্ত পরহেযগার ওলী হয়ে গেলেন। সুতরাং আমরা দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই মাহফিলে খালেছ তওবা করার তাওফীক দান করেন।

অষ্টম শর্ত

রোযা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মাগফিরাতের অষ্টম শর্ত

বাইশ পারার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ এমন দশটি শর্তের বর্ণনা করেছেন, যার উপর আমলকারি নর-নারীর জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তন্মেধ্যে আট নাম্বার হচ্ছে-

والصائمين والصائمات

রোযাপালনকারি নর-নারী। কেমন যেন রোযার ফযীলাতের প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করেছেন।

আত্মশুদ্ধি

ওলামায়ে কেরাম লিখেন যে আল্লাহ্ তা'আলা যখন নফস নামক একটি শক্তিকে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, من أنا ومن أنت؟ অর্থাৎ আমি কে এবং তুই কে? তখন সে উত্তর দিল : أنا أنا وأنت وأنت

অর্থাৎ আমি আবার কে? আমি তো আমিই। আর আপনি তো আপনিই। অতঃপর আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাকে এমন জবাবের ফলে আগুনের শাস্তি দিলেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করলে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। অতঃপর তাকে শৈত্য শাস্তি (শীতলতাজনক শাস্তি) দিয়ে; পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু সে পূর্বের ন্যায় উত্তর প্রদান করল। তারপর তাকে একটি বোঝার নীচে রেখে জিজ্ঞাসা করলে পূর্বের ন্যায় উত্তর প্রদান করল। এভাবে তিনবার এমন হল। সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তাবস্থায় রাখলেন। কয়েক বছর এভাবে রাখার পর জিজ্ঞাসা করলেন, যে এবার বল, আমি কে আর তুই কে? তখন সে বলল, আপনি হলেন আমার প্রভু এবং আমি হলাম আপনার বান্দা।

সুতরাং সেখান থেকেই আল্লাহ তা'আলা তৃষ্ণা ও ক্ষুধাকে মানবসত্তার আত্মশুদ্ধির চিকিৎসা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

রোযা সকল ধর্মের ইবাদত ছিল

দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে যতগুলো শরীয়ত এসেছে সবগুলোতে ইবাদত হিসেবে রোযা নির্ধারিত ছিল। সুতরাং হযরত আদম আ. যখন দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন তখন তিনি মাসের তের, চৌদ্দ, এবং পনের তারীখে দেখতেন যে চন্দ্র তার পূর্ণ উজ্জ্বল্যে থাকে। তখন থেকে তিনি ঐ তিন দিন রোযা রাখতেন। আর ঐ তিন দিনকে أَيَامِ بِيضٍ (আইয়ামে বীয) এর রোযা বলা হয়ে থাকে। যেহেতু তিনি জান্নাত থেকে দুনিয়ার জগতে পা দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি একা ছিলেন। আর সাধারণত অন্যান্য দিনের রাত অন্ধকারময় থাকে কিন্তু যখন তা উজ্জ্বল থাকে তখন তার কাছে উক্ত দৃশ্যটি খুব ভালো লাগত। তাই তিনি রোযা রাখতেন। এ ধরনেরই একটি ঘটনা শুনুন। হযরত ইউসুফ আ. কে তার ভায়ের সন্ধ্যাবেলায় কূপে নিক্ষেপ করে নিজেদের পিতার কাছে রাত্রিবেলায় ক্রন্দনরতবস্থায় আসল। যেমন কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ অতঃপর তারা নিজেদের পিতার কাছে এশার সময় কেঁদে কেঁদে আসল। তো হযরত ইউসুফ আ. এর বয়স ছিল একদম কম।

আবার তাকে অন্ধকার একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল। ফলে তার পেরেশানী ও অস্থিরতা বেড়ে গেল। অতঃপর রাতের আঁধারও নেমে আসল। তখন হযরত ইউসুফ আ. অনেকটা ঘাবড়ে গেলেন এবং তার ভয় ভীতি তীব্রাকারে ধারণ করল। এভাবেই তার রাত অতিবাহিত হল। তো যখন সুবহ সাদিক হল, এবং অন্ধকার দূর হয়ে আলো দৃষ্টিগোচর হতে লাগল তখন তিনি কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করলেন। সুতরাং কিতাবের মধ্যে লিখা হয় যে তিনি ঐ সময় দু'আ করেছেন। আয় আল্লাহ! এখন আপনি আমার এই বিপদকে দূর করে মুক্তি দিয়ে দেন এবং দুনিয়ার সমস্ত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকেও তাদের বিপদ দূর করে দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন।

সুতরাং এখন আমরা একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করি যে দুনিয়ার যে কোন রুগ্ন ব্যক্তি, চিন্তিত ব্যক্তি যাদের রোগ-ব্যধি ও পেরেশান দিনে ছিল এবং রাতেও ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাহরীর সময়ে এত বরকত রেখেছেন যে সমস্ত রোগীদের রোগ এবং পেরেশানগ্রস্তদের পেরেশান কমে যায় তখন। এই সময়কে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত সকলের জন্য সহজ করেছেন। আর এই সময় যে এত বরকতময় এর কারণ হচ্ছে হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় প্রভুর নিকট এই ব্যপারে দু'আ করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিছেন।

হযরত নূহ আ. আশুরার দিন তথা দশই মুহাররাম রোযা রাখতেন।

হযরত দাউদ আ. এর অভ্যাস ছিল একদিন রোযা রাখা আরেক দিন না রাখা। অর্থাৎ বছরে ছয় মাসই রোযা রাখতেন। হযরত মূসা আ. যখন তূর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেলেন তখন ৪০ দিন রোযা রেখেছেন।

হযরত ঈসা আ. ৭ দিন রোযা রেখেছেন। তাছাড়া হিন্দু ব্রাহ্মণরা চব্বিশটি রোযা রাখত। সুতরাং দুনিয়াতে এমন কোন ধর্ম বাকী ছিল না যেখানে রোযা একটি ইবাদত হিসেবে ছিল না। তবে হ্যাঁ অন্যান্য ধর্মের রোযা অসম্পূর্ণ ছিল। যেমন ঈসায়ী ধর্মের রোযা। কারণ তাদের রোযার শর্ত ছিল

যে আগুনে পাকানো কোন বস্তু খাওয়া যেত না। এছাড়া সবকিছু খাওয়া যেত। যেমন, রুটি খাওয়া নিষেধ ছিল কিন্তু পানি পান করা জায়েয ছিল। মোটকথা অন্যান্য সকল ধর্মের রোযা ছিল অসম্পূর্ণ। ইসলাম ধর্ম এসে রোযাকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

রোযার তিনটি স্তর

এই রোযার তিনটি স্তর রয়েছে।

(১) আওয়াম তথা জনসাধারণের রোযা। তা হচ্ছে খানা-পিনা এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। যে এই তিনটি কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে তাকে আওয়ামদের রোযা বলা হয়

(২) খাওয়াস তথা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের রোযা তা হল খানাপিনা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অঙ্গসমূহকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। ফলে অঙ্গসমূহর রোযা হয়ে যাবে। যেমন, চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখা, কান দিয়ে ভুল কোন কিছু না শুনা, যবান দিয়ে মিথ্যা না বলা এবং গীবত না করা। আর এটা খাওয়াসদের রোযা বলা হয়। অনেক মানুষকে দেখা যাবে যে রোযা রাখে কিন্তু আমলের ইহতিমাম করে না, নামায ও পড়ে না অথবা গান-বাদ্য শুনে বা অনেক মহিলারা পরস্পর বসে গীবত করতে থাকে।

(৩) আর বর্তমানে তো গীবত এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে এটাকে গীবত মনে করা হয় না (বরং এটা গু-ভাত হয়ে গেছে)। আজ-কাল কোন মহিলাকে যদি বলা হয় যে তুমি তো গীবত করেছ। তখন সে একধাপ এগিয়ে বলে যে গীবত করলাম কোথায়? আমি যা সত্য তাই বললাম! অথচ গীবত বলা হয় যে আপনি কারো অনুপস্থিতে এমন কথা বলা যা শুনলে অনুপস্থিত ব্যক্তির খারাপ লাগবে। এখন যদি আপনার কথাটি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তা গীবত হবে আর যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তবে তা অপবাদ হবে। যদি কারো ব্যাপারে কিছু বলার থাকে তবে তার সামনা-সামনি বলবে। আগে-বা পিছনে কেন? শরীয়ত তো এটাকে কঠিনভাবে অপছন্দ করেছে এবং এর থেকে বিরত থাকতে বলেছে। যেমন হাদীসে

ইরশাদ হচ্ছে- الغيبة أشد من الزنا। অর্থাৎ গীবত হচ্ছে যিনার চেয়ে অধিক মারাত্মক।

নবী কারীম সা.-এর যুগে দু'জন মহিলা রোযা রাখাবস্থায় পরস্পর কথা বলছিল। রোযার কারণে তাদের বহুত ক্ষুধা পেয়েছিল। এমনকি মরে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছিল। তখন নবী কারীম সা. কে ব্যাপারটি জানানোর পর তিনি বললেন, তাদের এই অবস্থা রোযার কারণে নয় বরং তারা রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে। তখন আরয করা হলো, হে আল্লাহর নবী, তারা তো রোযা ভাঙ্গেনি। তখন তিনি বললেন, যে তাদেরকে কুলি করতে বল। যখন তারা কুলি করল তখন তাদের মুখ থেকে ছোট ছোট কয়েকটি গোশতের টুকরা বের হল। অতঃপর নবী সা. বললেন, যেহেতু গীবত করা মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়ার নামান্তর। তাই মুজেযা স্বরূপ তাদের মুখ থেকে মৃত ব্যক্তির গোশতের টুকরা বের হয়েছে। কারণ তারা রোযা রাখাবস্থায় গীবত করেছে। সুতরাং উক্ত বিষয়ে আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত যে গীবত কতই না ঘৃণিত কাজ ।

৩। আখাচ্ছুল খাওয়াস তথা অধিকতর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রোযা। আর এটা সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর রোযা। তা হচ্ছে নিজেকে পানাহার, স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত রাখা, স্বীয় অঙ্গসমূহকে গুনাহ থেকেও বাঁচিয়ে রাখা এবং নিজের অন্তরকে গাফলত তথা উদাসীনতা থেকে বিরত রাখা। আর পুরা দিন এভাবেই অতিবাহিত করা। এমনকি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত থেকে বিন্দু মাত্র ও গাফলতি উদাসিন থাকে না। এটাকেই কামেল রোযা বলা হয়।

রোজার উপকারিতা

এতে কোন দ্বিমত নেই যে আল্লাহ তা'আলা এই রোজাতে অনেক আশ্চর্য ফায়দা রেখেছেন।

মস্তিষ্ক সচল ও তরতাজা থাকে

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে ব্যক্তি রোযা রাখে অথবা কম খানা খায় তার মস্তিষ্ক ফ্রেশ ও পরিস্কার থাকে। বৈজ্ঞানিকরা লিখেছেন যে তার চিন্তামত ও বুদ্ধিমত্তার স্তর অনেক উঁচু মানের থাকে। আর অতিরিক্ত

খাওয়ার দ্বারা মানুষের মধ্যে গাফলতী চলে আসে এবং যেহেন যাকাওয়াত হ্রাস পেয়ে যায়। এই কারণেই যে ধুমধাম বেশি খাবে সে অবশ্যই সেই পরিমাণ শুয়ে ঘুমাবে অর্থাৎ খানা আর ঘুম উভয়টির মাঝে লাযেম-মাযলুমের সম্পর্ক। মোটকথা যে যত খাবে তার ঘুমও তত আসবে। কম খেলে কম ঘুম আসবে। আর বেশি খেলে বেশি ঘুম আসবে। অল্প খেলে তার তবীয়ত তথা স্বভাব ঠান্ডা প্রকৃতির এবং ফ্রেশ থাকে। আর যে পেট ভরে খায় তার তন্দ্রা চলে আসে এবং বাহ্যত তার মস্তিষ্ক কাজ করে না। বরং বেশি খাওয়ার কারণে তা স্লো হয়ে যায়। মোটকথা কম খাওয়ার উপকারিতা মধ্যে একটি হচ্ছে দেমাগ তথা মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও ঠান্ডা থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালার নেয়ামতের ক্বদর বুঝে আসে

উলামায়ে কেরাম লিখেন যে, কম খাওয়ার ফায়দাসমূহ থেকে একটি ফায়দা হচ্ছে যে মানুষের পক্ষে আল্লাহর নেয়ামতরাজির ক্বদর বুঝে আসে। যেমন ঃ কেউ গ্রীষ্মকালে রোযা রাখল। প্রচন্ড গরম, এবং পানির তীব্র তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও পানি পান করেনি। তখনই তার পানির নেয়ামত উপলব্ধি হবে যে এটা আল্লাহ তা'লার কত বড় নেয়ামত এবং অনুকম্পা। যখন নেয়ামতের কদর বুঝে না আসে তখন সেটা নষ্ট ও অপচয় হয় এবং এ ব্যাপারে মানুষের কোন অনুভূতি থাকে না। আমরা সাধারণত ঘরের অধিকাংশ মহিলাদেরকে দেখি যে পানির টেপ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে লেগে যায়। আর এদিক দিয়ে পানি অপচয় হতে থাকে। এই কারণে তার নেয়ামত ক্বদর করার অনুভূতি নেই। আবার অনেক বাচ্চাদেরকে দেখা যাবে যে সে ছাঁদে বা বাথরুমে গিয়ে পানির টেপ ছেড়ে দিয়ে ব্রাশ করতে থাকে। যতক্ষণ ব্রাশ করে ততক্ষণ টেপ চালু থাকে। ফলে পানি অপচয় হয়। আর উদাসীনতার কারণ হচ্ছে নেয়ামতের ক্বদর বুঝে না আসা। আর তাদের তো এই খবর নেই যে এই পানি আল্লাহ তা'য়ালার কত বড় নেয়ামত যা অপাত্রে ব্যবহার করা নিষেধ।

প্রিয় উপস্থিতি! ওই সমস্ত লোকদের কাছ গেলে পানি নামক নেয়ামতের ক্বদর বুঝা যাবে, যারা এমন স্থানে বসবাস করে যেখানে পানি পাওয়া খুব দুস্কর। বরং তারা এক ফোঁটা দু ফোঁটা করে পানি জমা করে রাখে।

আমরা তো পাহাড়ি এলাকাসমূহে দেখেছি যে মহিলারা বরতনে পানি ভরে মাথায় করে ঘরে নিয়ে যায়। এখন একটু চিন্তা করুন তো! ঐ সমস্ত মানুষ পানিকে কি পরিমাণ ক্বদর করবে? কারণ তাদের তো এই পানি দিয়েই ওযু, গোসল, এবং পান করতে হবে। তাই যখন মানুষ পানির ক্বদর বুঝবে তখনই সে তা যথাস্থানে ব্যবহার করবে। কিন্তু আফসোস! আমরা তো এই নেয়ামতের ক্বদর করি না। অথচ হাদিছে এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিন এক বান্দাকে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে পেশ করা হলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে প্রশ্ন করবেন যে, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নেয়ামতসমূহের হক্ব আদায় করেছো? উত্তরে সে বলবে, পরওয়ারদেগার! আমি তো অনেক বড় ইবাদতকারি তোমার বান্দা ছিলাম। আমি তো খুব ভালো ছিলাম। আমার জীবন সবসময় ভালো কাজে লাগিয়েছি। আমি তো এভাবে আপনার নেয়ামতসমূহের হক্ব আদায় করে দিয়েছি। যখন আমি তো পাঁচশত বছরের হায়াত পেয়েছিলাম। সে বলবে আমি তো আপনার সমস্ত নেয়ামতের হক যথাযথ আদায় করে দিয়েছি। তারপর হাদীছে এসেছে যে, তখন আল্লাহ তা'লা তাঁর কুদরতের হাতে তাকে তৃষ্ণার্ত করে দিবেন। একপর্যায়ে তার তৃষ্ণা এত বেড়ে যাবে যে তার জীবন চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে। আর সে ছটপট করে বলবে! কে আছ? আমার মুখে এক ফোঁটা পানি তুলে দিবে। তখন এক ফেরেশতা ঠান্ডা পানির একটি পেয়ালা তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসবে। তার তৃষ্ণা আরো বেড়ে যাবে। আর সে ফেরেশতাকে বলতে থাকবে আমাকে পানি দাও।

তখন ফেরেশতা বলবে যে যাবৎ না তুমি আমাকে পানির মূল্য দিবে। দুনিয়াতে তো মানুষ একজন আরেকজনকে বিনিময়স্বরূপ টাকা-পয়সা, ও ধন-দৌলত দিতে হয় কিন্তু আখেরাতে এগুলো ধর্তব্য হবে না। বরং বিনিময়স্বরূপ নিজের নেক আমল দিতে হবে। তখন এই বান্দা বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে। এই পানির বিনিময়ে আমি আমার জিন্দেগীর এক বছরের আমল তোমাকে দিব। কিন্তু ফেরেশতা তা মানবে না। তখন বান্দা বলবে, আচ্ছা ভাই দু বছরের আমল দিব। বলা হবে না। আবার বলবে আচ্ছা তাহলে তিন বছরের আমল দিব। কিন্তু ফেরেশতা কোনভাবেই

মানবে না। এমন করতে করতে বান্দা তৃষ্ণা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলে উঠবে যে, আমার অর্ধেক জিন্দেগীর আমল তোমাকে দিয়ে দিব। কিন্তু ফেরেশতা এতেও রাজি হবে না। বিভিন্ন কিতাবে লেখা হয় যে সে এক পর্যায়ে পিপাসার জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উপায়হীন হয়ে বলে উঠবে; যে ভাই! আমি আমার সারা জীবনের সমস্ত নেকি দিয়ে দিব তবুও আমাকে পানি পান করতে দাও। যখন সে এক পেয়ালা পানির জন্য নিজে সমস্ত নেকীকে ফেরেশতার কাছে অর্পণ করে দিবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! আফসোস তোর জীবনের সমস্ত নেকী আমার এক পেয়ালা পানির কাছে হার মানতে বাধ্য হল। এবার তুই চিন্তা করে দেখ জীবনে কৃত পেয়ালা পানি পান করেছিস! কত নেয়ামত ভোগ করেছিস! তবে তুই কিভাবে দাবি করছ যে আমার সমস্ত নেয়ামতের হক্ব আদায় করে দিয়েছিস!!

প্রিয় উপস্থিতি! বাস্তবিকভাবেই আমরা একটু চিন্তা করলে দেখব যে, আল্লাহ তা'য়ালার নেয়ামতের ক্বদর তখনই বুঝে আসবে যখন অন্তরে অনুভূতি থাকে। আর রোযা রাখার দ্বারা অন্তরে এ বিষয়ে অনুভূতির জন্ম নেয়।

এখন একটি রুটির দিকে লক্ষ্য করুন! যখন আমরা তা ভক্ষণ করি তখন একটু চিন্তা করা উচিত যে এটা আমার কাছে আসতে কতটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। কেউ জমিনকে পরিষ্কার করে উর্বর করে তুলেছে। জমিনে বীজ বপন করেছে। পানি সিঞ্চন করা হয়েছে। অতঃপর ঐ ক্ষেতকে সূর্য আলো দিয়েছে। বাতাস অক্সিজেন দিয়েছে। কীটপতঙ্গ থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে এটা বড় হয়েছে। এক পর্যায়ে কেউ এটাকে ক্ষেত থেকে কেটে তার থেকে গম বের করেছে। তারপর পিশে আটা বানানো হয়েছে। অতঃপর কেউ এটাকে রুটি বানিয়েছে। তখন এই সমস্ত স্তর অতিক্রম করার পর আমাদের কাছে রুটির একটা লুকমা এসেছে। কিন্তু হায় আফসোস! এতদসত্ত্বে দস্তরখানে কোন একটি লুকমা পড়লে আমরা তা দ্বিতীয় বার উঠিয়ে খেতে সংকোচ করি। বরং দস্তরখানের সাথে এটাকে ফেলে দেওয়া হয়।

আমরা হজ্ব এবং উমরার মধ্যে রুটি অনেক অপচয় করতে দেখেছি যদ্দরুণ হতভম্ব হয়ে গেলাম। মোটকথা রিযিকের ক্বদর করা হয় না। যদি ক্বদর করা হত তবে মানুষের পক্ষে রিযিক এভাবে নষ্ট করা সম্ভব হত না। সর্বশেষ এটাই দাঁড়ালো যে রোযার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নেয়ামতরাজির ক্বদর বুঝে আসে।

গরীব-দুঃখীদের সাথে সহানুভূতীর জযবা সৃষ্টি হয়

রোযার আরেকটি ফায়দা হচ্ছে যে গরীবদের সাথে মহানুভবতার জযবা বৃদ্ধি পায়। কারণ মানুষ যখন নিজেই ক্ষুধার্ত থাকে তখন তার দিলে এই অনুভূতি আসে যে গরীবদের কাছে তো খাওয়া-দাওয়ার মত কিছু নেই। সুতরাং তারা কিভাবে জীবন-যাপন করে। তাদের দিবা-নিষি কিভাবে অতিবাহিত হয়? ঐ দরিদ্র তার বাচ্চাদেরকে ক্ষুধার্তাবস্থায় দেখে কিভাবে সহ্য করে। তখন তার কেমন লাগে? তাই রোযার মাধ্যমে গরীবদের সাথে সদাচারণ করার এহতেমাম তথা অনুভূতি আসে। তাই তো দেখা যায় যে, এ ধরনের রোযাদার মহিলাদের কাছে যদি কোন বিধবা নারী অথবা কোন অপারগ বিবাহিত মহিলা আসে, তবে তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। কারণ তার তো গরীব এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের অবস্থা জানা আছে। আর মহিলারাই যেহেতু ঘরের খেদমতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে তাই তাদের মধ্যে যে যত বেশী অনুভূতিশীল হবে সে তত বেশি অন্যের খেদমত করবে। আর যদি কারো অনুভূতিই না থাকে তাহলে তো বাচ্চা ক্ষুধার্তাবস্থায় বসে থাকবে আর সে কোন ভ্রুক্ষেপই করবে না। স্বামী অফিস শেষ করে খানা তলব করলে সে বলবে, আমি তো খানাই পাক করিনি। কারণ তার তো ক্ষুধার অনুভতি নেই। আর যেই মহিলার অনুভূতি রয়েছে- তার ঘরে কোন মেহমান আসলে সে প্রথমে তাকে খানা দিবে। কারণ সে তো সফর থেকে এসেছে, তাই তার কি পরিমাণ ক্ষুধা লেগেছে অনুমান করা যাবে না। হাদীছে ও এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, মেহমান যখন ঘরে আসবে তখন দুটি কাজ করা উচিত। একটা তো খানাপীনার ব্যবস্থা করা। যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি উপস্থিত করা। কারণ হতে পারে

তার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে বা অনেক তৃষ্ণা লেগেছে। আর দ্বিতীয়টি হল আমাদের ওলামায়ে কেরাম যেমনটা লিখে থাকেন। তথা মেহমানকে বাথরুম বা গোসলখানা ইত্যাদি দেখিয়ে দিবে যাতে সে তার হাজত আদায় করতে পারে। কারণ অনেক সময় পেশাব-পায়খানার খুব প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু লজ্জায় বলতে পারে না। তাই আগত মেহমানের জন্য প্রথমে খানা প্রস্তুত করবে আর তাকে বলে দিবে যে, আপনি হাত মুখ ধৌত করে ফ্রেশ হয়ে নিন, তাহলে তার জন্য হাজত আদায় করা সহজ হয়ে যাবে। আর এধরনের কাজ তো বান্দা তখনই করতে পারে যখন তার মধ্যে অনুভূতি থাকে।

রোযা এবং ইচ্ছাশক্তি

রোযার আরেকটি ফায়দা হচ্ছে এর মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। কারণ ঘরে খাওয়ার মত অনেক কিছু যেমন বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, পানিয় ও ফল-ফলাদী রয়েছে আবার সে ক্ষুধার্ত ও এতদসত্বেও সে এক ফোটা পানি পান করে না, কোন কিছু আহার করে না। বরং নিজেকে সবকিছু থেকে সংযত রেখে ধৈর্যধারণ করে। আর এই ধৈর্য ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, রোযা রাখার দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয় এবং মনোবল বৃদ্ধি পায়। তখন তার বোধগম্য হয় যে, আরে আমার তো এ কাজটা করা উচিত ছিল কিন্তু করিনি বা এই কাজটা করা আমার পক্ষে ঠিক হয়নি। অতঃপর যখন এভাবে মহিলাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে তখন তার জন্য সুখে-দুঃখে সদা-সর্বদা জীবন পরিচালনা করা সহজ হয়ে যাবে। কারণ জীবন চলার পথে কখনো কখনো আলোর সাথে আঁধারও নেমে আসে। তাই এই আঁধারকে কিভাবে মুকাবেলা করতে হবে এটা জেনে রাখলে তাদের জন্য ভবিষ্যতে অনেক সহজ হবে। আজ, এক মহিলা খুব স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করছে কাল হতে পারে তার স্বামী মারা গেছে অথবা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ফলে সে ও তার বাচ্চারা গরীবানা যিন্দেগী অতিবাহিত করার সম্মুখীন হতে হবে। তার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা নেমে আসবে। আর তার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিকুলতা এড়িয়ে চলার ক্ষমতা

তখনই সম্ভব হবে যখন তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকবে, সুতরাং রোযা মানুষের মনোবলকে দৃঢ় করে দেয়। এই কারণেই তো অনেক মহিলাকে দেখা যায়, যাদেরকে লোকেরা খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় কিন্তু তারা নিজেদের দারিদ্রতার দরুণ উপায়হীন হয়ে ও নিজেদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করে তাদের কথা মানবে তো দূরের কথা তাদের দিকে তাকায়ও না। আর তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকার প্রতিই ইঙ্গিতবহন করে।

এই কারণেই তো হযরত থানভী রহ. বলেছেন, যে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে এমন অনেক সতি সাধি মহিলা রয়েছে যারা অন্য কোনো গাইরে মাহরাম পুরুষদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না এবং অবৈধভাবে কোনো পুরুষকে কথা বলার সুযোগ দেয় না। তারা কেমন যেন জান্নাতের হুরগণ যেই গুণে গুণান্বিত তারা ও সেই গুণে গুণান্বিত। আর এধরনের কাজ বান্দা তখনই করতে পারে যখন তার কুওয়াতে এরাদী দৃঢ় ও মজবুত থাকে। অন্যথায়, অর্থাৎ তার মনোবল যদি দূর্বল থাকে তবে তো সাধারণ কোনো পরিবর্তনে সে নিজেকে আরেকজনের কাছে অর্পণ করে দিবে। তখন তার মান-সম্মান ও ইজ্জত আব্রু সব চলে যাবে। অবশেষে আমরা বুঝতে পারলাম, যে রোযার মাধ্যমে মানুষ আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ় মনোবলওয়ালা ব্যক্তি হয়ে যায়।

রোযা এবং দৈহিক সুস্থতা

রোযার ফায়দাসমূহ থেকে আরেকটি ফায়দা হচ্ছে যে কম খাওয়ার দ্বারা মানুষের দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সঠিক থাকে। এখন আমরা অসুস্থ ব্যক্তিদের সংখ্যা জরিপ করলে দেখব যে তাদের অনেকেই বেশী খাওয়ার কারণে, কম খাওয়ার কারণে নয়। পাকস্থলিতে যে আলসার হয় এটা বেশী খাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। এমনিতেই ব্লাড প্রেশার, ও সুগার ও বেশী খাওয়ার কারণেই হয়। বর্তমান তো বেশী খাওয়া আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। যদ্দরুণ আমাদের মাঝে অসুস্থদের সংখ্যা অনেক দেখা যায়। কারণ হুকামাহরা লিখেছেন যে যদি কোনো বান্দা একটি খেজুর খায় তবে সেই খেজুরের মধ্যে এত পরিমাণ গিযা তথা খাদ্য রয়েছে যে যদি সে তিন দিন

পর্যন্তও কিছু না খায় তবুও ক্ষুধার তাড়নায় সে মারা যাবে না। এখন চিন্তার বিষয় হল যে, যদি এক খেজুরের মধ্যেই এই পরিমাণ শক্তি থাকে তবে আমরা কতগুলো ভক্ষণ করি। আমরা দশ ডাবল বেশী খাই। অথচ এ সব খাদ্য শরীরের কাজে আসে না, বরং অল্প কিছু লুকমা। যদি কেউ বেশী খাওয়া থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তার জন্য উচিত পাঁচ-সাত লুকমা করে খাওয়া। এভাবে যদি অল্প কিছুদিন খায় তবে অবশ্যই কম খাওয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। শরীরের ওযনে কন্ট্রোলে চলে আসবে এবং এর মাধ্যমে সে হাল্কা হয়ে যাবে। ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে। বর্তমানে মেয়েদের অনুভূতি জাগে। ফলে ওযন কমানোর জন্য ডায়েট করে। এর কিবা প্রয়োজন রয়েছে। এর পরিবর্তে নফল রোযা রাখবে। একদিন রাখবে আরেক দিন ভাঙ্গবে। এভাবে তার ওযন কমে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা ইবাদতও হয়ে যাবে। চিকন ও হাল্কা পাতলা হওয়ার জন্য এর প্রয়োজন নেই বরং রোযা রাখলেই চলবে। প্রথম যমানার মহিলারা তো অধিকহারে রোযা রাখতো। মাঝে মধ্যে আমাদের রোযা রাখা উচিত। যার ওযন বেশী তা কমানোর জন্য রোযা রাখা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে তার চাহিদা পূরণ হবে সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যও লাভ হবে।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, মানুষ কোন কিছু খাওয়ার সময় এ বিষয়টি মাথায় রাখবে যে কোন খাদ্যের কারণে ওযন বেড়ে যায়। তবে তার থেকে বিরত থাকবে। আর কোন খাদ্যের কারণে ওযন বাড়ে না তবে তা পেট ভরে খাওয়ার কারণেও বাড়বে না। উদাহরণস্বরূপ যেই সমস্ত সবজি যমীনের নীচে হয় সেগুলো সাধারণত শরীরের ওযন দ্রুত বাড়িয়েও দেয়। যেমন আলু, শালগম, গাজর, মুলা ইত্যাদি। আর যে সমস্ত সবজি যমীনের উপর উৎপন্ন হয়। যেমন, লাউ, কদু ও বেগুন ইত্যাদি জাতীয় বস্তু খাওয়ার দ্বারা সাধারণত মানুষের ওযন বৃদ্ধি করে না। এখন যদি কারো ওযন কমানোই মাকসাদ থাকে তবে সে খানা-পিনা কন্ট্রোলে নিয়ে আসবে। ওযন তো তখনই বাড়ে যখন সতর্কতা ছাড়া যে কোন কিছু খাওয়া হয়। অতঃপর অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদি কেউ ওযনের আধিক্যতা

থেকে বেঁচে থাকতে চায় তবে তার জন্য তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। যেগুলো সন্দেহ ছাড়া ওযন বাড়িয়ে দেয়। সেগুলো হল সবগুলোর প্রথম শব্দ হল 'চ' চাউল, চর্বি এবং চিনি। যদি কেউ এগুলো থেকে সতর্ক থাকে তবে তার পক্ষে নিজেকে কন্ট্রোলে রাখা সহজ হবে। এই কথা তো ডাক্তারগণ বলে দিয়েছেন যে তিনটি সাদা বর্ণে বস্তু (চিনি, চাউল, আটা) গোটা দুনিয়ার মধ্যে একটি আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। দুনিয়াতে যত ধরনের রোগ-ব্যাধি রয়েছে সব এই তিনটির কারণেই হয়ে থাকে। ঐ তিনটির সাথে চর্বিও মিলিয়ে নিন তবে বিষয়টি পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই খাওয়া-দাওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাহলেই ওযন নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

প্রিয় উপস্থিতি! এতক্ষণ যাবত রোযা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা চলছিল, যে এটা একটি ইবাদত এবং এর মধ্যে আত্মিক ফায়দার সাথে সাথে শারীরিক ফায়দাও রয়েছে। এই কারণে বাচ্চারাও যদি চায় যে আমরা আমাদের শরীরের ওযন ঠিক-ঠাক রাখব তবে তারা নামাযও বেশী বেশী পড়বে, নফলও পড়বে, এবং রোযার ইবাদতও আদায় করবে। আর এই রোযার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে এই নেয়ামত দান করবেন, সাথে সাথে তার এটাও বুঝে আসবে যে ক্ষুধা বড় একটি নেয়ামত। আমরা তো স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধাকে আযাব মনে করে থাকি কিন্তু তা একটি আল্লাহ তা'আলার বড় নেয়ামত।

একদা হযরত বাইজিদ বুস্তামী রহ. ক্ষুধার ফযীলত বর্ণনা করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসল হযরত জ্বি! ক্ষুধার্ত থাকা ও কি কোন নেক কাজ? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! যদি ফেরাউনের ক্ষুধা পেত তবে সে কখনো খোদা দাবী করত না। কারণ সে এই কারণেই খোদা দাবী করেছে যে, সে কখনো ক্ষুধা অনুভব করেনি। সুতরাং বুঝা গেল যে বান্দার পেট খালী রাখাও আল্লাহ তা'আলার বড় নেয়ামত। কখনো কখানো পেটকে খালী রাখা উচিত যাতে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের ক্বদর বুঝে আসে।

পেটুকের কথায় কোন ধরনের প্রভাব থাকে না

আমাদের উলামায়ে কেরাম তো একটি আশ্চর্যজনক বিষয় লিখেছেন। তা হল যে ব্যক্তি পেট ভরে খানা খাওয়ার অভ্যাস করে নেয়, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, তার নসীহতের প্রভাব অন্য কারো মধ্যে পড়ে না। তারা আরও লিখেন যে পেটুকের কথা যেমন অন্য কারো মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না, ঠিক তেমনিভাবে অন্য ব্যক্তির কথাও তার মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। তাই বেশী খাওয়া ভাল নয়। কারণ হাদীসে এসেছে পেট ভরে খাওয়া আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অপছন্দনীয়। আর নবী কারীম সা. বলেছেন, যদি কোন বান্দা পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে খায়, এক ভাগ খানার জন্য, এক ভাগ পানির জন্য অপর ভাগ আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য, তবে এটাই তার জন্য সবচেয়ে উত্তম হবে।

সুস্থতার রহস্য

মদিনা শরীফে একদা কোন একজন হাকীম (কবিরাজ) দোকান চালু করল। তার ধারণা ছিল যে এখানে যেহেতু কোন হাকীম নেই তাই তার কবিরাজী সেখানে বেশী চলবে। এক বছর দু-বছর, এমনকি তিন বছর হয়ে গেল দোকান খুলল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন রোগী আসল না। তখন সে নবী কারীম সা. এর দরবারে এসে বললেন, যে হে আল্লাহর রাসূল সা., আমার কাছে আজ পর্যন্ত কোন রোগী আসেনি। অথচ আমার ধারণা ছিল যে, এখানে আমার বিজনেস অনেক চলবে। তখন নবী কারীম সা. বললেন, আমার সাহাবারা তো হচ্ছে এমন, যারা ক্ষুধা পেলে খানা খায়, কিছুটা বাকী থাকাবস্থায়ই খানা বন্ধ করে দেয়। এবং পেটের একটি অংশকে আল্লাহ তালার ইবাদতের জন্য খালি রেখে দেন। এই জন্যই তারা অসুস্থ হয় না। কেমন যেন হাদীসে সুস্থতার একটি রহস্য। বর্তমানে আমরা সাহাবায়ে কেরামদের মত খানা খাই না বরং অনেকে খানা খেয়ে চা খাওয়ার নাম দিয়ে আরো অনেক কিছু খেয়ে পেট আরো ভরে ফেলে। অথচ ক্ষুধা লাগার আগে আমাদের খাওয়া অনুচিত। এবং ক্ষুধা থাকতেই খানা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় দু-চার লুকমাহ

খাওয়া উচিত। এখন আমরা বুঝতেই পারছি যে, কম খাওয়ার দ্বারা মানুষ কত রকমের গুনাহ্ থেকে বেঁচে যায়। আজ এ বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করার কারণ হচ্ছে যেহেতু মহিলারাই ঘরে রান্না বান্না করে, দস্তরখান বিছিয়ে দেয়, এবং তারাই বাচ্চাদের খানা খাওয়ার আদব শিক্ষা দেয় তাই যদি মহিলারা এ বিষয়গুলো জেনে রাখে তবে তাদের জন্য বাচ্চাদের ঐ ভাবেই লালন করা সহজ হবে। এখন যদি তাদেরই এগুলো জানা না থাকে তবে তো তারা বাচ্চাদেরকে খানা দিয়ে তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে। ফলে বাচ্চারা সময়মত খাবে না। খানা নষ্ট করবে এবং অসময়ে খেয়ে পেট ভরে ফেলবে অত:পর পেট খারাপ হয়ে যাবে। যেহতু এ ধরনের কাজ আঞ্জাম দেওয়া মহিলাদের দায়িত্ব তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

রোযার আত্মিক ফায়দা

রোযার রুহানী তথা আত্মিক ফায়দাও অনেক। নবী আকরাম সা. ইরশাদ করেছেন, রোযা হচ্ছে মুমিনের ঢাল স্বরূপ। ঢাল হচ্ছে মানুষ যার মাধ্যমে আক্রমণাত্মক ও ক্ষতিকার বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করে। উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীছের বিষয় লিখেছেন যে, রোযা মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি জাহান্নামের আগুন, শয়তানের ষড়যন্ত্র, এবং নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মোটকথা মানুষের যেন্ট সমস্ত দুশমন তথা নফস, এবং শয়তানের সমস্ত চক্রান্ত থেকে বাঁচায়। মোটকথা রোযা এমন ঢালস্বরুপ যা মানুষকে বিভিন্ন ধংসাত্মক বস্তু থেকে রক্ষা করে।

দুটি গুণ

রোযার মধ্যে এমন দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে যেগুলোর কারণে মহিলাদেরকে বিশেষভাবে রোযা রাখার উৎসাহ দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, والصائمون والصائمات এই সিফাতটি এই কারণেই পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মধ্যে দুটি গুণ রয়েছে, যেই দুটির মধ্যে গুরুত্বের বিবেচনায় পুরুষ-মহিলা উভয়ে সমান।

(১) তাক্বওয়া

রোযার একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, রোযা রাখার দ্বারা মানুষের ভিতর আল্লাহ তালার ভয় সঞ্চার হয়। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, لعلكم تتقون যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। তো তাক্বওয়া কাকে বলে? তাক্বওয়ার শাব্দিক অর্থ হল, আল্লাহর ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়া অর্থাৎ মানুষের দিলে আল্লাহ তা'য়ালার এমন ভয় চলে আসা যদ্ধরুণ গোনাহের নিকটেও না যায় বরং সর্বদা এর থেকে বেঁচে থাকা। এই তাক্বওয়া যদি কারো ভিতরে পয়দা হয়, তবে তো সে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে যাবে। সুতরাং খোদাভীতির কারণে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, বান্দা যখন রোযা রেখে হালাল জিনিসগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে ছেড়ে দিবে তখন হারাম জিনিসগুলোকে আল্লাহ তা'লার জন্য ছেড়ে দেওয়া কি কষ্টের কাজ? হে আল্লাহ! আমরা যখন আপনার হুকুমে হালাল জিনিস খাওয়া ছেড়ে দেই, তখন আপনার সন্তুষ্টির জন্যে হারাম জিনিসগুলো আহার করা পরিত্যাগ করব না কেন? কারণ হালাল জিনিস তো অনেক বেশী, এবং হারাম জিনিস অনেক কম। (সুতরাং এগুলো ছেড়ে দিলে সমস্যা কোথায়?) আমরা তো চোখ ঘুরালেই দেখতে পাব যে, মদ একটি হারাম পানিয়, কিন্তু এর বিপরীত অনেক হালাল পানীয় রয়েছে। যেমন পানি, শরবত, খেজুরের রস, ডাবের রস ইত্যাদি। এবং শূকরের গোশত হারাম। কিন্তু এর মুকাবেলায় হালাল গোশত কত পদের আছে তার তো হিসাব নেই। যেমন : বকরী, ভেড়া, দুম্বা, গরু-মহিষ, মাছ, পাখি ইত্যাদির গোশত। অবশেষে বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে হালাল বস্তুর সংখ্যা অনেক হারাম বস্তুর তুলনায়। সুতরাং আমরা রোযা রাখার কারণে হালাল জিনিসসমূহ (যার সংখ্যা অত্যাধিক) খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারলে তবে হারাম জিনিস থেকে কেন বেঁচে থাকতে পারব না? যার সংখ্যা একদম হাতেগনা কয়েকটা। তাক্বওয়া মানুষের ভিতর খোদাভীতি সৃষ্টি করে। অতঃপর মানুষ শরীয়তের উপর খুব সতর্কতা অবলম্বন করে চলে। আর এই তাক্বওয়া শুধু খানা-পীনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমল, আখলাক, পরস্পর আচার-আচরণ, লেন-দেন, এবং কথাবার্তার মধ্যে ও তাক্বওয়া রয়েছে। যে নারী পাক্কা ও খাটি মুত্তাকী

হবে সে গুনাহের ধারে কাছে ও যাবে না। কিবা প্রয়োজন রয়েছে? অপর পুরুষের সাথে অবৈধভাবে ফোনে কথা বলে নিজের জীবনে ঝুঁকি নেওয়ার? কেনইবা সে অন্য কারো সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে নিজের জীবনে কালো দাগ ফেলার? এবং কেনইবা সে নিজেকে অন্য কোনো পুরুষের কাছে অবৈধভাবে অর্পণ করে স্বীয় দেহকে অপবিত্র করবে? বরং যে নারী মুত্তাকী হবে সে এগুলো থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। মোটকথা তাকওয়ার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে যায়, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, এবং ভালো কাজ করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

(২) ধৈর্য

দ্বিতীয় সিফাত হল রোযা মানুষকে ধৈর্য শিক্ষা দেয়। তাই তো হাদিস থেকে এসেছে যে, شهر الصبر অর্থাৎ রমযান মাস হচ্ছে, ধৈর্যের মাস। সুতরাং রোযা রাখার দ্বারা মানুষের ভিতর সবরের মাদ্দাহ তৈরি হয়। ফলে সে বিভিন্ন বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে। আর এই ধৈর্য হচ্ছে أم الأعمال অর্থাৎ সমস্ত আমলের মা তথা আমলসমূহের আত্মা সমতুল্য। নবী আকরাম সা. বলেছেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে বিবাহের উপায়-উপকরণ ও আসবাব থাকে তবে সে যেন বিবাহ করে ফেলে। আর যাদের কাছে নেই তারা যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তোমাদেরকে পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার জন্য সাহায্য করবে। হাদিসে যা বলা হল এর উপর আমল করা যায়। কখনো অনেক মহিলারা অতি অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে যায়। এখন তাদের স্বীয় প্রবৃত্তি ও শয়তান থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো রোযা। যদি তারা রোযা রাখে তবে তারা তাদের নফসের খাহেশাত ও চাহিদা থেকে বাঁচতে পারবে।

এমনিভাবে কুমারি যুবতী নারীদের জন্যও রোযা রাখা উত্তম ইবাদত। মোটকথা বিধবা ও কুমারী নারীদের অধিকহারে রোযা রাখা উচিত। শুধুমাত্র রমযানের রোযাই যে রাখবে এমন না, বরং প্রতি মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ও আইয়ামে বীযের রোযা রাখবে বা সপ্তাহে দু'দিন অথবা ১ দিন রোযা রাখবে। অথবা একদিন রাখবে আরেক দিন ভাঙ্গবে। এভাবে রোযা রাখা নিজের অভ্যাসে পরিণিত করে ফেলবে। এখন তো প্রায়

মহিলারা ঘরে অধিকাংশ সময় স্বামী ছাড়া একাকী থাকে, আর তার জন্য তো পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করা, এবং নিজের চিন্তা-চেতনা, ও ধ্যান-ধারণাকে পবিত্র রাখা উচিত। তাই এর জন্য রোযা হলো লাযেমী (আবশ্যকীয়) ইবাদত। সুতরাং আমাদের অধিকহারে রোযা রাখা উচিত। যেহেতু হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে হযরত আবু দারদা রাযি. র দ্বিতীয় স্ত্রী যার কুনিয়ত ছিল উম্মু দারদা। তিনি যুবতি থাকা অবস্থায় আবু দারদা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি খুব সুন্দরী ও জ্ঞানী এবং সতী-সাধী ও মুত্তাকী ছিলেন। মোটকথা তার মধ্যে সমস্ত গুণাগুণ ছিল। অত:পর হযরত মুআবিয়া রা. তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বললেন, যে তুমি এখনো অনেক ছোট। এই ছোট বয়সেই তোমার স্বামী মারা গেছে। তাই তুমি আমার কাছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও, এবং সুন্দরভাবে জীবনযাপন কর।

উত্তরে উম্মু দারদা বললেন, আবু দারদা তো আমার কাছে খুব প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিল। তাই জান্নাতে আমি তার স্ত্রী হয়ে যেতে চাই। এই কারণেই আমি দ্বিতীয় বিবাহ করব না। তারপর আমীরে মুআবিয়া তার কাছে বলে পাঠালেন যে, আচ্ছা ঠিক আছে! কারো কাছে বিবাহ না বসতে চাইলে সমস্যা নেই। কিন্তু পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার জন্য রোযার মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ কর।

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল যে, অবিবাহিতও কম বয়সী নারী এবং বিধবা নারী যার বয়স কম তাদের জন্য রোযা হল নিজেদেরকে পবিত্র রাখার সর্বোত্তম ইবাদত। আজকাল তো পাঁচ ছয় বার খানা খাওয়া অত:পর সন্তানদেরকে সঙ্গে গান-বাদ্য শোনা এবং টিভি ইত্যাদি দেখা আমাদের অভ্যাসের পরিণিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও মেয়েদের থেকে এটা করা যে, তারা যেন এদিক সেদিক কারো সাথে অবৈধ সমম্পর্ক গড়ে না তুলে এটাতো বোকামী ছাড়া কিছু নয়। (তাই প্রথমে নিজেরা সতর্ক হওয়া উচিত) পবিত্রতার যিন্দেগীর অতিবাহিত করার একটি সহজ পন্থা তো-যা শরীয়ত বলে দিয়েছে-অর্থাৎ রোযা রাখা। তাই মহিলাদের উচিত রমযানের রোযার

ইহতিমাম করা, তা ছাড়া অন্যান্য দিনে ও মাঝে মধ্যে রোযা রাখা উচিত। যেন আল্লাহ তা'লার রবকত ও নূর তাদের উপর নাযিল হয়।

প্রিয় উপস্থিতি! লক্ষ্য করুন। এখন আমি আপনাদেরকে দুটি ধৈর্য সম্বলিত ঘটনা শোনাব। আর এই ঘটনাদ্বয় আল্লাহ তা'আলার কাছে এতই পছন্দ হয়েছে যে এগুলো কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। আজ আমি দুটি আয়াতে কারীমা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, যাতে দুটি নারীর ঘটনা রয়েছে।

হযরত ফাতেমা রা. এর ধৈর্য

একদা হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. দুই শাহজাদা কঠিনতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত ফাতেমা রা. মান্নত করেছেন যে, হে আল্লাহ! যদি তারা সুস্থ হয়ে যায় তবে আমি তিন দিন রোযা রাখব। এমনিভাবে হযরত আলী রা. ও রোযা রাখার মান্নত করেছেন। কিছুদিন পর আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে দুই শাহজাদা-সুস্থ হয়ে গেল। যখন উভয়ে সুস্থ হয়ে গেল তখন হযরত ফাতেমা রা. একদিন রোযা রাখলেন। সন্ধাবেলায় হযরত আলী রা. ইফতারীর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসলেন। কিন্তু ইফতারীর কিছুক্ষণ পূর্ব মুহূর্তে কেউ যেন দরজায় করাঘাত করল। জিজ্ঞাসা করা হল কে? উত্তরে বলা হল! মদীনার এক মিসকীন, যার কাছে খাওয়ার মত কিছুই নেই। অনেকক্ষণ যাবৎ ক্ষুধার্ত। আমি এই ঘরে এই জন্য আসলাম কারণ এই ঘর থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। অত:পর হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রাযি. ইফতারীর জন্য যা আনা হয়েছিল তা ঐ মিসকীনকে দিয়ে দিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী শুধু পানি দিয়ে ইফতারী করলেন। পরের দিনের সাহ্রী ও পানি দ্বারা করলেন। এভাবে পুরা দিন অনেক ক্ষুধাও তৃষ্ণা বরদাশত করার পর যখন সন্ধ্যার সময় হল তখন ইফতারীর জন্য কিছু খাদ্য আনা হল। এখনো ইফতারীর কিছু সময় বাকী রয়েছে। হঠাৎ কে যেন দরজায় খটখট আওয়াজ করল। জিজ্ঞাসা করার হল কে? উত্তরে বলা হল যে, মদিনার এক ক্ষুধার্ত মিসকীন ও ইয়াতীম।

তখন হযরত ফাতেমা রা. ঘরে যা ছিল তাকে দিয়ে দিলেন, এবং পানি দিয়ে ইফতারী করলেন। তৃতীয় দিনের রোযাও পানি খেয়ে রেখেছেন। (এখন আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে, কেউ যদি না খেয়ে তিন দিন এভাবে রোযা রাখে তাহলে তার অবস্থা কত কঠিন হবে?) যাই হোক তিনি সারাদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা কাটিয়ে সন্ধ্যায় উপনীত হলেন। তখন তার কাছে ইফতারী করার মত কিছু ছিল। কিন্তু ইফতারীর কিছুক্ষণ পূর্বে একজন দরজায় করাঘাত করলে জিজ্ঞাসা করা হল কে?

জওয়াবে বলা হল আমি হলাম এক বন্দি, ক্ষুধার্ত। আর এখানে আসার কারণ হল এখান থেকে কেউ খালি হাতে ফেরত যায় না। তখন ফাতেমা রা. চিন্তা করলেন যে, সে এক ভিক্ষুক, আল্লাহর নামে প্রার্থনা করেছে। আর আমি আল্লাহর নামে প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেই না। তাই তিনি তৃতীয় দিন ও নিজে যা খেয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা তার এই বান্দি এবং তার ক্ষুধা ও পিপাসাকে এতই পছন্দ করলেন যে, তার ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল করে দিলেন,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

আর তারা আল্লাহর ভালবাসায় ইয়াতীম, মিসকীন ও বন্দিকে খাবার খাওয়ায়। তার ক্ষুধা নিবারণ তৃতীয় দিন হয়েছে। কিন্তু তিনি তো অনেক বড় নেয়ামতের অধিকারী হয়ে গেছেন। আজও আমরা তার সেই ইবাদতকে কুরআনের যবানে স্মরণ করি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করা হবে। ওয়াহ! ওয়াহ! প্রভু হে! আপনি কত বড় ক্বদরকারি! আপনার মহব্বতে যেই বান্দা আমল করবে তার আমলকে কুরআনের অংশও বানিয়ে নিয়েছেন। তো তার মধ্যে ধৈর্যের মাদ্দাহ থাকার কারণেই তিনি তিন দিন এভাবে ক্ষুধার্ত থাকতে পেরেছেন এবং তিন দিনই ভিক্ষুককে সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন।

হযরত আসিয়া রা. এর ধৈর্য

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে ফেরাউনের স্ত্রীর। যার নাম ছিল বিবি আসিয়া। আসিয়া বিনতে মুযাহেম। তিনি হযরত মূসা আ. এর প্রতি ঈমান আনায় ফেরাউন ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হল। ফেরাউন তাকে বলল, আমি খোদা দাবি করছি, আর তুমি আমার স্ত্রী হয়ে আমার ঘরে থেকে মূসার প্রতি ঈমান এনে ফেলেছ? তুমি অতিশিঘ্রই এর থেকে ফিরে আস। উত্তরে তিনি বললেন, আমি ঈমানের স্বাদ পেয়েছি। তাই এখন আমাকে কুফরের দিকে ফিরানো সম্ভব নয়। ফেরাউন বলল, দেখ! আমি কিন্তু তোমাকে আমার ঘর থেকে বের করে দিব, তোমার সম্মান নষ্ট করে ফেলব, এবং তোমাকে সমস্ত নেয়ামত থেকে মাহরুম করে ফেলব। এখন আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, তিনি তো রাজ্যের রানী ছিলেন এবং ফেরাউনের প্রথম বিবী ছিলেন। কি বিশাল অট্টালিকায় থাকতেন, যখন যা চাইতেন তাই পেতেন, সবকিছু তার জন্য উম্মুক্ত ছিল, কোন কিছু চাইলে ইশারা মাত্রই চলে আসত। মোটকথা খুব স্বাচ্ছন্দে ছিলেন। কিন্তু ঈমান এমন এক মূল্যবান সম্পদে যা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে বান্দা নিজেকে যে কোন কুরাবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি ফেরাউনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, যে আমি কখনো পিছপা হব না। ফেরাউন কঠিনভাবে রাগ করল। আর স্বামীরা যখন স্ত্রীদের উপর রাগ করে তখন তাদের সাথে পশুর মত আচরণ করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুক। তখন ফেরাউন লজ্জা-শরম ভুলে গিয়ে বলতে লাগল, যে এই আসিয়াকে আমার সামনে উপস্থিত কর। বিবী আসিয়াকে বন্দি করে সামনে পেশ করা হল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তো তিনি ছিলেন রাজরানী। এখন হয়ে গেলেন বন্দী। দরবারের সবাই তার কান্ড দেখছিল। ফেরাউন তাকে বলল, সর্বশেষ বার তোমাকে বলছি, তুমি ফিরে আস। এখানে যদি মাফ চেয়ে নাও মাফ করে দিব এবং পুণরায় রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু যদি ফিরে না আস তবে তোমাকে এখানেই বেইজ্জতীর সাথে হত্যা করব। তিনি নির্ভয়ে বলে উঠলেন, فاقض ماأنت قاض তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। আমি ঈমান থেকে বিন্দু পরিমাণ দূরে সরব না। অতঃপর সে পুলিশদের আদেশ করল

তাকে বস্ত্রহীন করে ফেলার। এখন আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন তো যে, যদি কোন নারীকে বলা হয় যে, তোমাকে সমস্ত মানুষের সামনে আজ উলঙ্গ করা হবে, তখন সে কি পরিমাণ লজ্জা পাবে? এমন লজ্জা পাবে যে আর্তনাদ করতে থাকবে। যমীনটা কেন ফেটে যায় না? আমি এর ভিতরে ঢুকে যাব। মহিলাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বভাবগত লজ্জা-শরম একটু বেশী দিয়েছেন। আর তিনি তো ছিলেন একদম খাঁটি, সতী-সাধী নারী। তাই তার তো লজ্জা আরো বেশী পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

সকলের সামনে তাকে বস্ত্রহীন করে হাত পায় শিকল দিয়ে বেঁধে মাটিতে ফেলে দিলো, যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। কোন কোন কিতাবে লিখা হয়, ফেরাউন তাদেরকে আদেশ করল যেন জীবিতাবস্থায় তার শরীরের চামড়া তুলে উঠানো হয়। অতঃপর কর্মকর্তারা ব্লেড ইত্যাদি নিয়ে এসে জিবিত থাকাবস্থায় চামড়া উঠানো শুরু করে দেয়। একটু চিন্তা করে দেখুন তো যদি যিন্দা মানুষের চামড়া ব্লেড দিয়ে উঠায় তবে তার কেমন লাগবে? কি পরিমাণ কষ্ট লাগবে? আর তিনি তো খুব পাতলা প্রস্থতির ছিলেন। তাই কষ্ট বেশী পাওয়ারই কথা। কিন্তু ঈমান তাকে এতই মজবুত এবং শক্তিশালী করে দিয়েছে যে তিনি এর উপরও ধৈর্যধারণ করেছেন। তবুও ঈমান থেকে পিছপা হন নি।

এই সময় তিনি আল্লাহ তা'লার কাছে একটি ফরিয়াদ করেছিলেন। হে আল্লাহ! কুখ্যাত যালিম ও নরপিশাচ ফেরাউন আমাকে আপনার ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আর নারীরা বাড়ি-ঘরহীন হওয়া খুব কষ্টের বিষয়। কিন্তু হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি এর বিনিময়ে আপনার কাছে একটি ঘর চাই। যাকে কোরআনে এভাবেই করা হয়েছে-

قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

হে আমার রব! আপনি আমার জন্য এর বিনিময় জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার কাছে এই বান্দির ঈমানের অটল থেকে ধৈর্যধারণ করাটা এতই পছন্দ হয়েছে যে এটাকে কুরআনে ব্যক্ত করেছেন এবং তার দু'আকে কুরআনের একটি অংশ বানিয়ে ফেলেছেন। তাই যখনই আমরা কোরআন পড়ি তখনই তার ফরিয়াদকে আল্লাহর কালামে পাকে পাঠ করি।

খুব আশ্চর্যের বিষয়। আহ! ফেরাউন তার উপর যেমন যুলুম করেছে এবং শক্তি খাটিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে আসিয়ার ধৈর্য ও তেমন ছিল। কত জীর্ণ-শীর্ণ ও চিকন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে এত বড় কুরবানী করেছেন? একটু লক্ষ্য করুন।

হে নারীগণ! তোমরা বিবি আসিয়াকে তোমাদের মডেল বানাও, যে, আমরা ও প্রত্যেক ফেরাউন থেকে দূরে সরে আল্লাহ তা'য়লার সন্তুষ্টিমূলক জীবনযাপন করব এবং যা কিছু কুরবানী করার দরকার সবকিছু কুরবানী করব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ও জান্নাতে ঘর তৈরীর জন্য নিজেকে বিসর্জন করে দিতেও প্রস্তুত রয়েছি। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সমস্ত মহিলাদেরকে দুনিয়ার ইবাদত ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময় জান্নাত নসীব করুন।

আল্লাহ তায়ালা বিনিময়দাতা

আল্লাহ তা'আলা বিনিময়দাতা। হুজুর সা. হযরত খাদিজা রা. কে তাঁর মৃত্যুর সময় বললেন, হে খাদিজা! তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি জান্নাতে গিয়ে আমার বিবিদের কাছে সালাম পাঠাবে। খাদীজা রা. অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী সা.! দুনিয়াতে তো আপনার সর্বপ্রথম স্ত্রী আমিই ছিলাম। সুতরাং জান্নাতে আবার আপনার স্ত্রী আসবে কোত্থেকে? নবী আকরাম সা. বললেন, আল্লাহ তা'আলা বিবি মরিয়ম ও বিবি আসিয়াকে জান্নাতে আমার স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ যে কত বড় বিনিময়দাতা একটু লক্ষ করুন, বিবি আসিয়া তো শুধুমাত্র জান্নাতে একটি ঘর চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ঘর তো দিয়েছেন সাথে সাথে ঘরওয়ালাও দিয়ে দিয়েছেন। যেই বান্দাই তাঁর

কাছে কিছু চায়, তার চাওয়া কম থাকে কিন্তু আল্লাহ তা'লা চাওয়ার চেয়েও বেশী দিয়ে দেন। আয় আল্লাহ! আপনি কত বেশী বিনিময়দাতা! আপনি আমাদেরকে আমাদের চাহিদার চেয়েও বেশী দান করেন। রমজান মাসে আমরা তার কাছে যা চাই তিনি এর চেয়ে অনেক বেশী কল্যাণ দান করেন।

ইতিকাফের জামাতে যারা নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারের চৌখাট আকড়ে ধরে বসে থাকে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অক্ষমতা এবং ক্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন।

প্রিয় উপস্থিতি! আমরা যেই সমস্ত মহিলারা নিজেদের কাম কাজকে আগে পিছে করে নিয়মিত মজলিসে উপস্থিত হই, মজলিসে এসে মনযোগ দিয়ে বসে যাব, এবং নোটিশ বানিয়ে আলোচনাগুলোকে স্মরণ করে আমলে আনার চেষ্ঠা করব। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তা'লা আপনাদের (আমল নামাকে) কবুল করুন এবং আজকের এই বরকতময় দিনে আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কামনা করি তিনি যেন আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তার নৈকট্যশীল বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন

নবম শর্ত

চারিত্রিক পবিত্রতার বিবরণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মাগফিরাতের নবম শর্ত

এটি সূরায়ে আহযাবের ২২ পারার দ্বিতীয় রুকুর আয়াত, যাতে আল্লাহ তায়ালা দশটি শর্তের বর্ণনা করেছেন। এগুলোর উপর আমলকারি নর-নারীর জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। মুমিনদের জন্য তো এটা মহাখুশির খবর। এই দশটি শর্তের আলোকে আমাদের জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। যাতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দয়া ও করুণা দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে দান করেন। সেগুলোর মধ্যে নবম শর্ত হল: والحافظين فروجهم والحافظات নিজেদের ইজ্জত সংরক্ষণকারী নর ও নারী। আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ধর্মকে লজ্জা ও পবিত্রতার ধর্ম বানিয়েছেন। যেমনটি নবী কারীম সা. বলেছেন, الحياء شعبة من الإيمان লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

লজ্জা নারীদের স্বভাবগত বিষয়

আল্লাহ তা'লা স্বভাবজাতভাবেই মহিলাদেরকে লজ্জা নামক নেয়ামত দিয়ে লালন-পালন করেছেন। যদ্ধরুণ নিজেদের সম্ভ্রম ও ইজ্জত রক্ষা করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

এই কারণেই তো কোরআন কারীমে যেখানে চুরির আলোচনা এসেছে সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ চুরি করনেওয়ালা পুরুষ-মহিলা। কিন্তু যেখানে যিনার আলোচনা এসেছে সেখানে আল্লাহ তা'লা এভাবে ব্যক্ত করেছেন, اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা। অর্থাৎ উভয়টির মধ্যে উসলুব পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই মুফাসিসরীনে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাধারণত পুরুষগণই চুরির কাজ বেশী করে থাকে। কারণ তার মধ্যে মহিলার তুলনায় বেশী হিম্মত ও সাহস রয়েছে। এবং তার তো নিজেই নিজের ও পরিবারের উপার্জন করতে হয়। আবার আল্লাহ তায়ালা তাকে বাহিরে আসা যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাই তার থেকে চুরি প্রকাশ পাওয়া তার জন্য খুব দোষণীয় ব্যাপার। এই কারণেই যেখানে চুরির আলোচনা এসছে সেখানে প্রথমেই পুরুষ লোকের আলোচনা এসেছে। আর যেখানে যিনার কথা এসেছে সেখানে মহিলার কথা আগে এসেছে। এর কারণ হল, যদিও পুরুষের পক্ষ থেকে যিনা প্রকাশ পাওয়া খুব জগণ্যতম কাজ। কিন্তু যদি এর সূচনা হয় মহিলা থেকে তবে তো এটা আরো ভয়ঙ্কর ও খরাপ কাজ।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাকে সূচনালগ্ন থেকেই লজ্জা শরম একটু বেশী দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। তাই শরীয়ত তার ব্যাপারে এই আশা রাখে যে, সে নিজেই নিজের ইজ্জতের হেফাজত করবে। কারণ স্বভাবত পুরুষ নিজের আত্মতৃপ্তি মিটানোর জন্যে মহিলার দিকে ধাবিত হওয়া একটি সহজবোধ্য বিষয়। তাই মহিলার উচিত নিজে অটল ও অবিচল থাকবে। পরপুরুষকে তার নিকটে আসতে দিবে না। যদি সে গাইরে মাহরাম থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তবে সে আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্যশীল বান্দী হিসাবে পরিগণিত হবে।

নারীর জিহাদ

সম্ভ্রম রক্ষা করা নারীর জন্য কেমন যেন এক প্রকারের জিহাদ। এই জন্যই যেই নারী পবিত্রতার যিন্দেগীর পরিচালনা করবে এবং কুমারী থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে আল্লাহ তা'লা তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের কাতারে দাঁড় করাবেন। নারী তার ইজ্জত-আব্রু ও শরিয়তে ইসলামীয়াহ রক্ষা করা আল্লাহ তায়া'লার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় সমুন্নত করে দিবেন।

ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার গুরুত্ব

কমবয়সী-কুমারী মেয়েদের এই বিষয়ের গুরুত্ব জানা ও মাথায় রাখা উচিত যে, মহিলার সমস্ত বিষয় মেনে নেওয়া যায় কিন্তু যদি সে নিজের ইজ্জতের উপর চুন-কালি লাগায় তখন কিন্তু এটা মেনে নেওয়া যায় না। আর যে সমস্ত মেয়েরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজের ইজ্জত আব্রুকে হারিয়ে ফেলে, আহ! তারা কি করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সমাজের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে যায় এবং তাদের খারাপ দৃষ্টি তাদের উপর পতিত হয়। অত:পর তাদের পুরা জীবনে একটি কাল দাগ পড়ে থাকে যদ্ধরুণ তারা অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়ে জীবন যাপন করে। যদিও এই ধরনের কাজ পুরুষ লোকেরা করে থাকে কিন্তু তাদের তাতে শাস্তি পোহাতে হয় না। কিছুদিন তো অপমানের কষ্ট সহ্য করতে হয় বটে কিন্তু অল্প কিছুদিন পর তা ভুলে যায়।

কিন্তু নারীর জন্য তো এটা তার সারা জীবনের জন্য কালো দাগ পড়ে থাকবে। তাই যুবতী মেয়েদের জন্য এর গুরুত্ব বুঝা অপরিহার্য যে, আমাদের সামান্যতম একটা ভুলের কারণে আমাদের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে এবং পুরা ফেমিলির মান ইজ্জত সব মাটির সাথে মিশে যাবে।

প্রিয় উপস্থিতি! এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য হযরত মারয়াম এর কাহিনীকে স্মরণ করুন। তিনি যখন গর্ভবতি হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করলেন, তখন তারা বলতে লাগল,

يَا أُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো বদকার ছিল না, তোমার মাও তো ব্যভিচারী ছিল না।

এখন একটু লক্ষ্য করুন, তারা মারয়ামের নাম নিয়ে কিভাবে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল! যে তুমি তো কুমারী ছিলে। এখন দেখি গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে এসেছ। তারা তো তাকে তিরস্কার করেছেই সাথে সাথে পিতা-মাতা-ভাই-বোনদের নাম নিয়েও তিরস্কার করেছে। ভাল করে একটু চিন্তা করুন। ত্রুটি বিচ্যুতি একটি মেয়ে থেকে প্রকাশ পায় কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ও বদনাম গোটা ফেমেলি তথা পিতা-মাতা, ভাই- বোন ও সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে গ্রাস করে ফেলে। এবং সমাজের কাছে তারা সকলেই কালারিং হয়ে যায়। এই কারণেই বর্তমান মেয়েদের উচিত এই ব্যাপারে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে চলাফেরা করা।

আমাদের মেয়েরা কেনইবা এই ক্ষেত্রে ভুল করে বসে? এবং কেনইবা এই বিষয়টি বুঝে না? অথচ তারা এটা ভালভাবেই বুঝে যে, বিদ্যুতের তার ও কারেন্টে হাত দিলে তাকে শর্ট করে ফেলে দিবে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে মৃত্যুর দিকে ঢেলে দিবে। তাই তারা তো এই ক্ষেত্রে কখনো ভুল করে কারেন্টে হাত দিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঢেলে দেয় না।

যেহেতু তাদের কাছে কারেন্টে হাত রাখলে কি হবে এ বিষয়টি সূর্যের মত স্পষ্ট তাই এখন যদি কোনো মেয়েকে কেউ বলে, যদি তুমি কারেন্টের তারটিতে এই খোলা হাত দাও, তাহলে আমি তোমাকে উপহার দিব, এবং এই দিব, সেই দিব মোটকথা যা চাও তাই দিব। এখন তো সে বলবে, অসম্ভব! এখানে হাত দিলে তো আমার জীবন চলে যাবে, তো কিভাবে আমি এখানে হাত দিব?

ঠিক তেমনিভাবে যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে অবৈধ কাজের জন্য আহ্বান করে তখন যদি তার কাছে এর পরিণতির বিষয়টি কারেন্টের তারে হাত দেওয়ার পরিণতির মত সুস্পষ্ট ও পরিস্কার থাকে। যেমনঃ এই আহ্বানে সাড়া দিলে তো আমি আল্লাহ তালার রোষাণলে পতিত হয়ে যাব এবং আমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

ফলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। তবে তো সে কষ্মিনকালেও তার কাজে সাড়া দিয়ে নিজের জীবন বরবাদ করবে না। সুতরাং ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার ক্ষেত্রে নারীদের খুব দৃঢ় ও মজবুত থাকা উচিত। যেন তারা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অনেক বড় প্রতিদান পেয়ে যায়।

পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত কারিনি এমন অনেক মহিলার বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়, তাদের দু'আ আল্লাহ্ তা'য়ালা কিভাবে কবুল করেছেন। এ ধরনের মেয়েরা যখন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে হাত উঠায় তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। আর এই সমস্ত খারাপ কাজে ধাবিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। যেগুলোর আলোকে আমি অধম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব লিখেছি যা প্রতিটি নারীর পড়া এবং নিজের জীবনকে ঝুঁকি থেকে বাঁচানো উচিত।

কুদৃষ্টি যিনা পর্যন্ত পৌঁছায় দেওয়ার একটি মাধ্যম

এই কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমে বলেছেন, وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَا তোমরা যিনার নিকটও যেয়ো না। এর উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ যেই জিনিস যিনার প্রতি উৎসাহিত করে তার কাছেও যেয়ো না। উদাহরণ স্বরূপ কুদৃষ্টি যিনার দিকে ধাবিত হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই কুদৃষ্টি হল যিনার প্রথম ধাপ। কুদৃষ্টি যেমন পুরুষদের জন্য নিষেধ তারা বেগানা নারীদের দিকে না তাকানো ঠিক তেমনিভাবে নারীদের জন্যও নিষেধ। যেমনটি কোরানে কারীমে এসেছে, قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি (বেগানা নারী থেকে) অবনত রাখে।

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ এবং মুমিন নারীদেরও বলে দিন তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টি (পরপুরুষ থেকে) অবনত রাখে।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা গেল যে غض البصر দৃষ্টি অবনত রাখে। মুমিন নর নারী সকলের জন্যই উত্তম। কেননা শয়তান তো বলে যে,

নারী হল আমার তীরসমূহের থেকে একটি তীর। যখন সে বেগানা পুরুষের সামনে পর্দাহীন আসে তখন আমি ঐ বেগানা পুরুষের অন্তরে কুচিন্তা ঢেলে দেই, যাতে সে ঐ নারীর সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে। নবী কারীম সা. বলেছেন, যদি অনিচ্ছাবশত কারো উপর দৃষ্টি পড়ে যায় তবে সেটা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমা করা হবে না। বরং শাস্তির যোগ্য হবে। ঠিক তেমনিভাবে প্রথমবারও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি চলে যায় তবে সেটার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই আমাদের এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, কুদৃষ্টি ফেতনা-ফাসাদ এর চাবি স্বরূপ এমনকি যিনার দিকে পৌঁছানোর অন্যতম একটি মাধ্যম।

হাদীসে পাকে এসেছে, যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ তা'য়ালা এর বিনিময়ে তার ঈমানের মধ্যে লাযযত তথা স্বাদ দিবেন।

কুদৃষ্টি দ্বারা পেট ভরে না

এটা এমন এক গুনাহ যার দ্বারা বান্দার পেট কখনো ভরে না এবং তার আত্মা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। বরং যত কুদৃষ্টি দিবে তত অন্তরে দাগ পড়বে। এটাও পরিস্কার কথা যে এর মধ্যে শুধু যুবক-যুবতীরাই যে লিপ্ত তা নয় বরং বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলারাও এতে লিপ্ত। আমার কাছে এক বৃদ্ধ লোক আসল যে খুব নেককার, মুত্তাকী ও বুযুর্গ ছিল এবং সমাজে খুব প্রসিদ্ধ লোক ছিল। তার চুলগুলো সাদা ছিল। তো সে এসে কান্না শুরু করল। তখন আমি বললাম, আপনি বাচ্চাদের মত এভাবে কান্না করছেন কেন? তখন সে বলল, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন! যেন আল্লাহ তায়ালা আমার দৃষ্টিকে পাক করে দেন। সুতরাং তিনি বৃদ্ধ হয়েও কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত নন।

কু-দৃষ্টির ক্ষতি

কু-দৃষ্টির ক্ষতিসমূহ থেকে একটি হল আল্লাহ তা'য়ালা আমলের তাওফিক ছিনিয়ে নেন। এই কারণেই যেই সমস্ত মেয়েরা দৃষ্টিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। তাদের জন্য নামাজ পড়া, পর্দা করা ইত্যাদি মসিবত

হয়ে দাঁড়ায় এবং মস্তিস্কে বিভিন্ন কু-চিন্তা ঢুকে যায়। ফলে পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে এবং ঘরের কাম-কাজও করে না। মোটকথা নেক আমল করার তাওফিক তার থেকে মাহরুম হয়।

কু-দৃষ্টির আরেকটি ক্ষতি হচ্ছে চোখের জ্যোতি দুর্বল হয়ে যায়। তাই যে বাচ্চারা কু-দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে না তাদের যেহেন শক্তি কমে যাবে। (চাই দুনিয়ার বিষয়ে হক বা দ্বিনের বিষয়ে হক) এখন একটা কথা স্বরণ করবে একটু পর ভুলে যাবে। এদিক দিয়ে সবক মুখস্থ করবে অপরদিকে ভুলে যাবে। আর যেই সমস্ত কুরআনে হাফেজদের যেহেন দুর্বল এর অন্যতম কারণ হচ্ছে কু-দৃষ্টি। আর এই কু-দৃষ্টি মানুষের বরকত শেষ করে দেয়। সুতরাং যারা কু-দৃষ্টি দিবে আল্লাহ তা'লা তাদের জীবনের বরকত শেষ করে দেন। এমনকি সময়, রিযক ও সুস্থতার মধ্যে কোনো ধরনের বরকত থাকে না।

একটি মেয়ে, সে যুবতী হওয়া সত্ত্বেও সে কু-দৃষ্টির দরুণ চোখে আঁধার দেখতে পায়, এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যায়। ফলে কাম কাজ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে যায়। এমনকি সে কম বয়সেই অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। আর শয়তান সর্বদা কু-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর আশাবাদী থাকে যে, আমি তাকে কোনো এক সময় গোনাহে লিপ্ত করব।

আল্লাহ্ তায়ালার গায়রাত

যখন কোনো বান্দা কুদৃষ্টি দেয় তখন আল্লাহ তায়ালার গায়রত তথা আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। এর উদাহরণ এভাবে বুঝতে পারেন কোন স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর সামনে বেগানা নারীর দিকে শাহওয়াতের সাথে তাকায় অথবা কোনো স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সামনে বেগানা কোন পুরুষের দিকে শাহওয়াতের সাথে তাকায় তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? তাদের গায়রতে কি পরিমাণ আঘাত লাগবে? এবার লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালার গায়রতে কি পরিমাণ আঘাত লাগবে? কারণ তার গায়রত তো বান্দার চেয়ে শতগুণে বেশী।

নবী আকারম সা. বলেছেন, أنا أغيرولد أدم والله أغيرمني আমি আদম সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহ তা'য়ালা আমার থেকে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ।

কু-দৃষ্টির উপর আল্লাহ্ তায়ালার লানত

কু-দৃষ্টির উপর অটল থাকলে আল্লাহ্ তায়ালা বদকার ও হতভাগা বানিয়ে দেন। এরকম অনেক ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে লিখা হয়। এক হাফেজে কুরআন ছিল। সে কু-দৃষ্টির উপর অটল থাকার কারণে কুরআন শরীফ ভুলে গিয়েছে। এক হাদিসে এসেছে, কু-দৃষ্টিকারি নর নারীদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার লানত বর্ষিত হয়। লানতের মানে কি? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত থেকে উভয়ে দূরে সরে যায়। তো এক আপনি বসে একটু চিন্তা করে দেখুন তো, আপনি আল্লাহ তা'য়ালার লানতের মধ্যে যিন্দেগী অতিবাহিত করছেন কি না? সুতরাং আমাদেরকে নিজেদের দৃষ্টির হেফাজত করে আল্লাহ্ তা'য়ালার লানত থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

কু-দৃষ্টি নাপাকী

অনেক আল্লাহওয়ালাদের তো এই অবস্থা হয় যে তারা কু-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দুঃর্গন্ধও অনুভব করতে পারেন। এবং তার ভিতরের নাপাকী ও অনুধাবন করতে পারেন। হযরত উসমান রাযি. এর একটি কাহিনী শুনুন, একদা এক সাহাবা তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে। পথিমধ্যে কোন এক বেগানা নারীর দিকে তার চোখ পড়ে যায়। কিন্তু এটা উসমান রাযি. দেখে বলে উঠলেন, ما بالكم লোকদের কি হয়ে গেল? কোন সতর্কতা ছাড়াই আমাদের কাছে চলে আসে? এবং নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে না। বরং তার দৃষ্টিতে তো যিনার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সে তো দিশেহারা হয়ে বলতে লাগল, আমিরুল মুমিনিন, ওহীর ধারাবাহিকতা কি এখনো বাকি রয়েছে? তখন তিনি বললেন, এটা ওহী নয় বরং মুমিনের অন্ত দৃষ্টি। আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন বান্দাকে এটা দিয়ে থাকেন। সুতরাং যাকে দিয়ে দিবেন সে এর মাধ্যমে কু-দৃষ্টির অন্ধকার ও এর পরিণতি সহজেই অবলোকন করতে পারে।

যেকোন মন্দ কাজকে শুরুতেই শেষ করে দেওয়া উচিত

এই কারণেই আমাদের উচিত মন্দ কাজকে প্রাথমিক পর্যায়েই খতম করে দেওয়া। ইংলিশে বলা হয় nip the euil in the buel অর্থাৎ মন্দ কাজ শুরুতেই শেষ করে দাও। সুতরাং যেহেতু কু-দৃষ্টির যিনার প্রথম ধাপ, তাই এর থেকে মানুষকে কঠিনভাবে বিরত থাকা উচিত। এর প্রভাব সোজা অন্তরে পতিত হয়। কু-দৃষ্টির কারণে মানুষের চেহারার নূর চলে যায়। কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে শয়তান এই ঢুকিয়ে দেয় যে, (সে বলতে থাকে) আমি তো শুধুমাত্র এদিক সেদিক তাকাউ, আমি তো কারো সাথে কথাবার্তা এবং কাউকে স্পর্শ ইত্যাদি তেমন কিছুই করি না। (তবে সমস্যা কোথায়?) কু-দৃষ্টির কারণে অনেক সময় পদস্থলিত ও অপমানিত হতে হয়। আবার কখনো স্বামী স্ত্রীর সোনার সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এই কারণেই সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই গুনাহ থেকে তওবা করা উচিত। আর এই কু-দৃষ্টি বাঁচার অনেক পদ্ধতি আমি حیااور فاکدامن নামক কিতাবে উল্লেখ করেছি। এখান থেকে আপনারা পড়ে নিবেন।

কু-দৃষ্টি থেকে উত্তরণের উপায়

এর মধ্যে একটি হচ্ছে কু-দৃষ্টির স্থানগুলো থেকে বিরত থাকা। যেমন মহিলা অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে বের হবে না। আর মহিলা ঘুরাফেরায় অভ্যস্ত হওয়া মানুষকে অনেক বেশী গোনাহে লিপ্ত করে ফেলে। স্ত্রীর উচিত স্বীয় স্বামীকে খুশী রাখা যাতে সুখময় যিন্দেগী যাপন করা যায়। তৃতীয় অন্য কোন ব্যক্তির দিকে তাকানোর কল্পনাও না করা। মানুষ নিজেই নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত রাখে। কারণ হাদিসে এসেছে, যে বান্দা দুনিয়াতে খারাপ কাজ করে এবং কু-দৃষ্টি দেয়, তার এক শাস্তি হল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দিদার থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। আহ! এটা কত বড় শাস্তি। যে মানুষ মাটির দেহকে দেখার কারণে আল্লাহর দিদার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। এই কারণেই হাদিসে এসেছে যে সমস্ত নারীরা চোখে সুরমা ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন লোহা গরম করে তাদের চোখে প্রলেফ দেওয়া হবে। কারণ এটা পুরুষদেরকে কু-দৃষ্টির প্রতি বেশী ধাবিত করে।

মহিলা স্বীয় পর্দার খেয়াল রাখবে

মহিলাদের উচিত স্বীয় পর্দার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। কারণ যদি সে নিজ পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং অসতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে তো সে পুরুষদের দেখার সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। আর পুরুষরা তো এই সুযোগই খোঁজে বেড়ায়। মূলত পর্দাহীনতাকে মহিলাদেরকেই কন্ট্রোলে আনতে হবে। বাহিরে বের হওয়ার সময় চেহারাকে হেজাব দিয়ে এভাবে ঢেকে বের হবে যেন বেগানা পুরুষ তার সৌন্দর্যের টেরই না পায়। মহিলা সাহাবাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তারা প্রয়োজনবশত যখন বাহিরে বের হতেন তখন সতর্কতামূলক দেয়ালের এত নিকট দিয়ে চলতেন যে তাদের কাপড় দেয়ালে লেগে থাকত। যাতে কোনো পুরুষ রাস্তায় মাঝখান দিয়ে হাঁটলেও তার ধারে কাছেও আসতে না পারে। সাধারণ দুঃসর্ম্পকের আত্মীয়দের সাথে পর্দার ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করা হয় এবং ভাল করে পর্দা করা হয় না। যদ্দরুণ এই অসর্তকতা অবশেষে যিল্লতী ও অপদস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর ও মহিলারা নিজেদেরকে পর্দাহীনতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

মোবাইলের মহামারী

বর্তমান যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য যা আবিষ্কার করা হচ্ছে তন্মধ্যে মোবাইল হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক বস্তু। আরে আল্লাহ তা'য়ালা তো তার বান্দাদের মধ্যেমে এটা আবিষ্কার করেছেন মহৎ উদ্দশ্যকে সামনে নিয়ে। আর তা হলো পরস্পর লেনদেন ও বিজনেস সহজতার সাথে আঞ্জাম দেয়া। কিন্তু বর্তমানে তো কঠিনভাবে এর অপব্যবহার করা হচ্ছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতেও এখন মোবাইল দেয়া হচ্ছে অহরহ। এমনকি সবসময় এটা নিয়ে গেমস খেলে এবং এদিক সেদিক বিভিন্ন জাগায় বিভিন্ন মেসেজ পাঠিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করছে। সুতরাং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে পিতা-মাতার উচিত বাচ্চাদের হাতে মোবাইল না দেয়া।

শয়তান বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়ার জন্য তাদের মাথায় এটা ঢুকিয়ে দেয় যে, পিতা-মাতাকে বলবে, আমরা স্কুলে যাওয়া আসার জন্য একটা মোবাইল প্রয়োজন। কারণ বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলতে হয়। এভাবে সে হাতে মোবাইল তুলে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নিজ লাভারের প্রেমিকের নাম্বার নিয়ে দিবানিশী কথা বলতে থাকে। আর বিভিন্ন ম্যাসেজ পাঠাতে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে পিতা-মাতার কোন খবরই থাকে না। ফলে তার জীবনে একটি কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয় যদ্দরুণ তার দ্বীন-দুনিয়া উভয়টাই বরবাদ হয়ে যায়। এবং মা-বাবার কথা শুনে না। ফলে মা বাবার অনেক গালিগালাজ শুনতে হয়। তার চাল-চলন দ্বারা তো বুঝা যায় যে, সে কোন রোগে আক্রান্ত। সবার থেকে পৃথক থাকে। লোকদের সামনে আসতে ভয় পায় এবং সব সময় আতঙ্কিত থাকে। মোটকথা তার জীবন একপর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, এবং পশু-পাখির জীবনের ন্যায় হয়ে যায়। সব কিছু থেকে বঞ্চিত থাকে। এভাবে তার সুন্দর ভবিষ্যত বরবাদ হয়ে যায়।

মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মায়ের উচিত নিজ সন্তানকে নেক ও সৎ বানানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। বিভিন্ন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং ভাল ভাল উপদেশ দেওয়া। একটি বিষয় তো আমার কাছে খুব খারাপ লাগে, ঘরের মোবাইলে রিংটোন বাজলে রিসিভ করার জন্য অনেক সময় যুবতী মেয়েকে পাঠানো হয় অথচ পিতা-মাতা ও ভাই পাশেই বসা। এটা কত বড় খতরনাক ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় যে, যখন মোবাইলে রিংটোন বাজে তখন যুবতী মেয়ে রিসিভ করার জন্যই দৌড় দিয়ে চলে যায়। তো ভাই! পুরুষ লোক কিসের জন্যে? বরং তারই উচিত ফোন রিসিভ করা। যদি পুরুষ না থাকে তবে তা মায়ের দায়িত্বে। কারণ তিনি বুঝবেন যে, কে ফোন করতে পারে। যুবতী মেয়েকে ফোনের নিকটে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়া উচিত। যদি কোন মেয়ে মোবাইল থেকে বিরত থাকে, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে যে, সে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য অর্ধেক পথ সফর করে ফেলল। আর

যেই ফ্যামিলি এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে, কেমন যেন ঐ ফ্যামিলির ৫০% মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকল।

আধুনিক কালের মহামারী

মোবাইলের ফেতনা আধুনিক কালের একটি মহামারী। প্রথম যুগে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা এই কারণে কম ছিল যে, একদিকে মেয়ে ঘরে বসে থাকত, অপরদিকে ছেলে তার সাথে সর্ম্পক স্থাপন করতে চাইত কিন্তু কোন মাধ্যম না থাকায় সম্ভব হত না। কারণ তখন অন্য কারো মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হত। তাই বিভিন্ন বিপদাপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তো কারো মাধ্যম লাগে না বরং এক মোবাইলই যথেষ্ট। এখন তো এমন এক মসিবত যে, বাচ্চারা কোমর বেঁধে নিশ্চিন্তে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে থাকে। আমাকে তো অনেকে বলে যে, ছেলে-মেয়েরা তিন-চার ঘন্টা যাবৎ পরস্পর কিভাবে এবং কি কথা বলে? কারণ তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক গোনাহের কথাবর্তা বলে। তাই শয়তান এর মধ্যে স্বাদ দিয়ে দেয়। আহ! আল্লাহ তা'য়ালা কত বড় ধৈর্যশীল! আমরা এত গোনাহ করা সত্ত্বেও আমাদের আকৃতি বিকৃতি করা এবং আমাদেরকে আযাব দেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। আল্লাহু আকবার!!

যৌথ অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা চাই

যৌথ অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা চাই। যেমন তথাকথিত বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠান এবং এজাতীয় অন্যান্য অনুষ্ঠান যেখানে মেয়েরা চমৎকার কাপড় পরিধান করে খুব সেজে গুজে এবং পরিপাটি হয়ে উপস্থিত হয়। কারণ তার জন্য তখন পর্দাহিনতা সহজ হয়ে যাবে এমনকি ভদ্র, পর্দানিশীন মেয়েরাও তখন পর্দাহীন হয়ে যাবে। কারণ যখন সে সুসজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে আসবে তখন তার মাথায় এটা কাজ করতে থাকবে যে, এখন যদি আমাকে কেউ দেখে তবে সে মনে করবে বাহ! কি সুন্দরী নারী! সুতরাং এই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এখানে মানুষের ঈমান ও আমলনামা বরবাদ হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

এমনিভাবে বেগানা কারো সামনে দেখা করা এবং তার সাথে কথা বলা থেকেও বিরত থাকা উচিত। কারণ কান টানলে মাথা আসে, কথায় কথা আসে, ফলে শয়তান তাদের উভয়ের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে দিবে। বেগানা কারো সাথে একাকী চলা যাবে না। এমনটি উলামায়ে কেরামগণ লিখেন যে, যদি রাবেয়া বসরীও হয় আর হাসান বসরী তাকে বসে একাকী খালি ঘরে কোরআন পড়ান তবুও শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলানোর চেষ্টা করবে।

গান-বাদ্য যিনার দিকে উৎসাহিত করে

মোবাইলের আরেকটি মসিবত হচ্ছে মিউজিক, গান-বাদ্য শুনা, টিভি দেখা ইত্যাদি। আর গান বাদ্য হল কানের যিনা। এক বর্ণনায় আছে যে, গান শুনার দ্বারা অন্তরে যিনার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এক হাদীছে আছে যে, গান বাদ্য শুনার দ্বারা অন্তরে এমনিভাবে নেফাকের প্রভাব পড়ে যেমন বৃষ্টির যমিনে পড়লে ক্ষেতের ফসল উৎপন্ন হয়। আজ তো আমরা অনেক দামি দামি টিভি কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখি। যেন মহিলারা কাজ শেষ করে এবং বাচ্চারা পড়া লেখা শেষ করে টিভি দেখতে পারে। এই টিভি তো শয়তানের সৈন্য সামন্তের একটি সৈন্য। অথচ আমরা সেটাকে আমাদের ঘরে সাজিয়ে রেখেছি।

এখন টিভির সমস্ত প্রোগ্রামের মধ্যে নাটক হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। কিন্তু জীবনে আমরা টিভিতে তো হাজারো ভাল মন্দ অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু সংশোধন হতে তো কাউকে দেখিনি। এখনো পর্যন্ত কোন মেয়ে বলতে পারবে না যে, আমি টিভি দেখে তাহাজ্জুদ গোযার হয়ে গেছি এবং আমি পর্দানিশীন হয়ে গেছি। আমরা যদি এমন মেয়েদের ব্যাপারে জরিপ চালাই যারা নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলেছে তো দেখা যাবে এই বেকার টিভি ও মোবাইলের কারণেই এমনটি হয়েছে।

এমনিভাবে বিভিন্ন অশ্লীল কিতাবাদী পড়া ও বিভিন্ন খারাপ গল্প কাহিনী শুনা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এগুলোর মাধ্যমে অন্তরে খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

বেগানা পুরুষ থেকে দূরে থাকা উচিত

মহিলা নিজেকে যত বেশী পরপুরুষ এর ছায়া থেকে দূরে রাখবে তত বেশী সে সংরক্ষিত থাকবে। এই কারণেই শরিয়ত বলে যে, মহিলা নিজের নাম ও অন্য কারো সামনে প্রকাশ করবে না। আর কথা বলার প্রয়োজন হলে নম্রভাবে কথা বলবে না বরং কর্কশ ভাষায় কথা বলবে।

মহিলারা যখন অন্য কারো সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলবে, তখন তার জন্য উত্তম হল আস্তে আস্তে কথা বলবে। কিন্তু এমনভাবে কথা বলবে কেমন যেন সে একজন ডাইনি, তাকে খেয়ে ফেলবে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যেই নারী পরপুরুষের সাথে একবার কর্কশ ভাষায় কথা বলে তখন ঐ পুরুষ দ্বিতীয়বার তার সাথে কথা বলার সাহস করে না। আর যে মেয়ে বেগানা পুরুষের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। এবং সেও নিজের ইজ্জত-আব্রু অধিক হেফাযতকারিণী হয়ে যায়।

সুতরাং শরীয়ত নারীকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন পর্দা ছাড়া, সুসজ্জিত ও সুগন্ধি লাগিয়ে বাহিরে না বের হয়। এবং পরপুরুষের পাশ দিয়ে চলাফেরা না করে। কোন বেগানা পুরুষের নিকট নিজ হাতে চিঠি না রেখে। তবে প্রয়োজন হলে অন্য কারো মাধ্যমে লিখে পাঠাবে।

এমনিভাবে কোন নারী বেগানা পুরুষের কাছে নিজের অবস্থা প্রকাশ করবে না। অনেক সময় বিবাহিতা নারীরা নিজেদের পার্সোনাল কথা পরপুরুষের সামনে পরামর্শের জন্য বলে ফেলে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ এটা তার জন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অনেক স্বামী এমন রয়েছে যে, স্বীয় স্ত্রীর গুণাগুণ ও সৌন্দর্য অন্যান্য সাথী সঙ্গীদের সাথে বর্ণনা করে অথচ এটা ঠিক না। কারণ শরীয়তে এই ব্যাপারে কঠোর ধমকি এসেছে যে, স্বামী স্ত্রী যদি পরস্পর মিলামেশা করার পর স্ত্রী অন্যান্য মহিলাদের নিকট আর স্বামী অন্যান্য পুরুষদের নিকট বর্ণনা করে তবে এই লোকটি শুকর আর মহিলাটি শুকরানীর মত। হাদিছে তাদেরকে শুকর বলা হয়েছে। শুকর যেহেতু সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নির্লজ্জ প্রাণী তাই ঘরের গোপন বিষয় অন্য কারো সাথে বলা অনুচিত।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখা

পিতা-মাতার জন্য নিজ সন্তানদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে এবং তাদের অবস্থা, ও রীতি-নীতি নোট করে রাখবে। সন্তান বড় হয়ে গেলে তার শয্যাস্থান পৃথক করে দিবে। আর তার জন্য নির্ধারিত কামরায় লক করার সিস্টেম না থাকা চাই। সন্তান নিজ কামরায় থাকবে, কিন্তু যদি মেয়ে হয় তবে মায়ের জন্য যে কোনো সময় দরজা খুলে তাতে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। আর যদি ছেলে হয় তবে পিতা যে কোনো সময় প্রবেশ করতে পারবে। দরজা বন্ধ না করা চাই। কারণ এদিক দিয়ে দরজা বন্ধ থাকলে হতে পারে শয়তান অন্যদিক দিয়ে গুণাহের দরজা খুলে দিবে। ফলে মা তো মনে করবে যে, সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্ত সে যে কামরায় মোবাইলে কথা বলছে, এবং মেয়েদের কাছে বিভিন্ন ম্যাসেজ ও ছবি পাঠাচ্ছে এটা কি মায়ের খবর আছে? তাই বর্তমানে সন্তাদেরকে স্বীয় কামরা লক করার অনুমতি দেওয়া অনুচিত। প্রয়োজন ছাড়া কাথা বা লেপের নীচে শয়ন করলে মায়ের লক্ষ্য রাখা উচিত যে কেন এভাবে শয়ন করেছে? কারণ হতে পারে এমন করেছে ফোনে কথা বলার জন্য। ফলে এভাবে সারা রাত্রি জাগরণ করবে অতঃপর দিন বারোটা পর্যন্ত ঘুমাবে। যুবক বাচ্চাদের গোসল করতে মাত্র কয়েক মিনিটের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু কখনো গোসলখানায় আধা ঘন্টা/এক ঘন্টা কাটিয়ে ফেলে। সুতরাং এ বিষয়টি ও লক্ষ্য রাখা চায়। যাতে সে بيت الخلاء (বাথরুম) কে (খালার বাড়ি) মনে না করে। আর যেই মায়েরা সন্তাদের উপর খুব সতর্ক থাকে তাদের বাচ্চারা খুব আতঙ্কে থাকে যে, আমি যদি বাথরুমে দু মিনিটের বেশী অবস্থান করি তবে আমার আম্মু দরজা খটখট করবে, তাই তারা বাথরুমে অতিরিক্ত সময় কাটাতে পারে না। সন্তানদের সমস্ত বিষয়ে পিতা-মাতার খেয়াল রাখা চাই। সে কখন স্কুলে যায়? আবার কখন ফিরে আসে? আসার সময় থেকে যদি পাঁচ মিনিট দেরি হয় তবে জিজ্ঞাসা করবে। কেন দেরি হল? এভাবে রোযানা তার থেকে সবকিছুর হিসাব নিবে। আজ তো অনেক সময় বাচ্চারা স্কুলে আবার অন্য কোথায়ও চলে

যায়। অতঃপর স্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্ত এদিক সেদিক বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড এর সাথে ঘুরাফেরা করে।

আমি যখন যুবকদের থেকে এই সমস্ত কাহিনী শুনি, তখন খুব অবাক লাগে, কিভাবে বাচ্চারা মা-বাবার চোখে এভাবে ফাকি দিয়ে নিজেদেরকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং পিতা-মাতার উচিত বাচ্চাদের পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও বাচ্চারা এটা কঠিন মনে করবে কিন্তু বড় হলে অবশ্যই বুঝবে যে, এটা তার জন্য খুব মঙ্গলজনক ছিল, এবং বলবে যে, এমন শাসনের কারণে আজ আমার ভবিষ্যত উজ্জল দেখছি।

যৌন চাহিদার স্বভাবগত চিকিৎসা

মানুষের ভিতর স্বভাবগত এক যৌন চাহিদা রয়েছে। যেমনিভাবে মানুষের আহার-নিদ্রা, ক্ষুধা-পিপাসা, এবং পেশাব-পায়খানার চাহিদা রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে যৌবনকালে পুরুষ-মহিলার ভিতর স্বভাবগত একটি যৌন চাহিদা রয়েছে। যার চিকিৎসা শরিয়ত বলে দিয়েছে। এর উত্তম চিকিৎসা হল যেই যুবতী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিবাহ দিয়ে দেওয়া উচিত। দ্রুত বিবাহ দিয়ে দেওয়া ও পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার জন্য বহুত জরুরী বিষয়। আজকাল তো অধিকতর উত্তম পাত্র তালাশ করতে গিয়ে মেয়েদের বয়স তেইশ, চব্বিশ, পচিশ বছরেরও বেশী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিবাহের কোনো খবর নেই। এখন একটু চিন্তা করুন তো? যেই মেয়ে ১৪ বছর বয়সেই যুবতী হয়ে যায়, সে কিভাবে ২৪ বছর পর্যন্ত নিজেকে সংযত রাখবে? কোনো না কোনো পন্থায়, কোথাও না কোথাও কোনো একটি গোনাহে লিপ্ত হবেই। অথবা কারো অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আমি তো অনেক জায়গায় দেখেছি যে, মেয়েদের বয়স তেইশ বছর হয়ে যায়, তবুও বিবাহ দেওয়া হয় না। কি অদ্ভুত বিষয়? পিতা-মাতার ঘরে একটি যুবতী মেয়ে কিভাবে দশ-বার বছর থাকতে পারে? তাই আমাদের উচিত সৎ পাত্রের সন্ধান পাওয়া মাত্রই অতি দ্রুত মেয়েদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া।

হযরত আতা উল্লাহ শাহ বুখারী রহ. এর ফরমান

হযরত আতা উল্লাহ শাহ বুখারী একদিন এক বাড়িতে গিয়ে দেখলেন যে, তার মেয়ের বয়স ২৩ পার হয়ে গেছে কিন্তু এখনো তার বিবাহ হয়নি। তখন হযরত তার মাকে বললেন, যে,আপনার মেয়ের বয়স তো অনেক বেশী হয়ে গেছে, তাকে অতিশীঘ্রই বিবাহ দিয়ে দেন। তখন তার মা একটু আগে বেড়ে বলতে লাগলেন, যে, হুজুর, আপনি কি বলেন? আমার মেয়ে তো এখনো অনেক ছোট, নাক টিপলে দুধ টপকে পড়ে। তখন হযরত বললেন, যদি এই দুধ ফেটে যায় তবে তো আর মানুষের কাজে আসবে না। বরং এটাকে কুকুর পান করবে। হযরতের কথাটা তো একদমই বাস্তব সম্মত। সাধারণত বিভাজনের কারণে আজ বিবাহ দেরি করা হচ্ছে। আমরা তো অনেক দেখি যে, বড় মেয়ের বিবাহের কাজ চলছে, অপরদিকে তার ছোট আরও তিনটি মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে আসছে। আজ পিতা-মাতা অযথা ছোট ছোট বলে মেয়েদের বিবাহ দেরি করা অনেক বড় ধরনের একটি ভুল।

গোনাহ্ করবে একজন কিন্তু বর্তাবে অনেকের উপর

একটি মাসআলা শুনে রাখুন, উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, যদি সন্তান বালেগ হওয়ার পর কোনো গুনাহ করে, তবে সন্তানের তো শাস্তি হবে ঠিক, কিন্তু এর সাথে পিতা-মাতাকে শাস্তি দেওয়া হবে যেহেতু তারা ফরজ কাজ (বিবাহ) আদায় করতে বিলম্ব করেছে। ভালো করে বুঝুন। কাজ করবে একজন কিন্তু শাস্তি হবে অনেকের। বৃদ্ধ মা ঘরে বসে সে গোনাহগার হচ্ছে, আবার বৃদ্ধ বাবা ও ঘরে বসে অপরাধী হচ্ছে। কারণ, তারা সন্তানকে বিবাহ দিতে দেরি করেছে। তাই আধুনিক ছেলে তালাশের পিছনে মেয়ের বিবাহকে বসিয়ে না রাখা চাই। তাহলে পুরো জীবনের জন্য বসে থাকতে হবে। বরং যখন সৎ ও নেক পাত্রের খোঁজ পাবে তখনই বিবাহের কার্য সম্পাদন করা চাই।

মেয়েদেরকে ভালো কাজে লাগিয়ে রাখবে

যদি বিবাহ দিতে কোন কারণবশত দেরি হয়ে যায় তবে পিতা-মাতার উচিত মেয়েকে ভালো কোন কাজে লাগিয়ে রাখা। যেন সে ধর্মীয় কাজে লেগে থাকে যেমন, কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআনের তাফসীর পড়া এবং হাদীছ পড়া ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে লোকদের দেখা যায় যে, মেয়েদের বিবাহ শাদী হতে দেরি হলে তাদেরকে কলেজে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর ইউনিভার্সিটিতে পাঠায়, (অর্থাৎ মেয়েদেরকে আটকিয়ে রাখার পন্থা এটা)। অথচ এটা সর্বজনস্বিকৃত বিষয় যে, কলেজ-ইউনিভার্সিটি মেয়েদের জীবন বরবাদের জন্য পারফেক্ট জায়গা। সেখানে তো যে কোনো ছেলে-মেয়ে যায়। তার অন্তর থেকে হায়া-শরম বের হয়ে যায়, কখনো ঈমান ও সিনা থেকে বের হয়। তাই মেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে বাড়ি-ঘরের কাজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। অযথা টাইম পার করার জন্য কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে সময় নষ্ট করা তো এমন যেমন আপনি কুকুরের সামনে গোশতের টুকরা নিক্ষেপ করে তার থেকে আশা করছেন যে, সে এটা খাবে না। যখন আপনি আপনার মেয়েকে ঘর থেকে ছেড়ে দিলেন তখন কিভাবে আপনি পরপুরুষকে আপনার মেয়ের দিকে চোখ তুলা থেকে বাধা দিবেন? বর্ণিত আছে যে, এক লোক তার স্ত্রীকে পর্দা করতে দিত না। যখনই তাকে বলা হত তখনই সে কোনো না কোনো বাহানা ধরে বসত। অতঃপর একদা এক ব্যক্তি দুই কেজি গোশত কিনে এক প্লেটে রাখলেন। অতঃপর সেই প্লেটটি মাথায় নিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর এক পাখি এসে প্লেটের গোশত নিতে নিতে এক পর্যায়ে শেষ করে ফেলল। তখন পাশের লোকটি তাকে বলতে লাগল, আরে আপনি কি বোকা নাকি? গোশত নিয়ে কি এভাবে হাঁটে? তাহলে তো পাখি নিয়ে খাবেই। উত্তরে লোকটি বললেন, আচ্ছা! আমি তো দু' কেজি গোশত পাখিদের সামনে রেখেছি আর তুমি তো তোমার ষাট কেজি বিবিকে মানুষের রেখে দিয়েছো? তবে কি লোকেরা তাকে ছু মেরে নিয়ে যাবে না? আরে ভাই তাকেও লুকিয়ে রাখ। তখন তাঁর হুশ ফিরে আসল যে, বাস্তবেই নারীদেরকে পর্দা ছাড়া রাস্তা-ঘাটে ছেড়ে দেওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ

বিষয়। সুতরাং আমাদের উচিত সর্বদা ভাল কাজ করা, তাহলে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যাবে। এর তরীকা হল কুরআন তেলাওয়াত করা, আল্লাহর জিকির করা এবং সব সময় ওযুর উপর থেকে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাওয়া।

অবসর থাকবে না

মেয়েদের উচিত নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য অবসর না থাকা, বরং যেকোনো কাজে লেগে থাকা। যদি পাঠদানের কাজে না লাগে তবে যেন ঘরের বিভিন্ন কাজে যেমন রান্না-বান্না, এবং মাকে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে লেগে থাকবে। মোটকথা অবসর না থাকা উচিত। কারণ অবসর থাকলে শয়তান বিভিন্ন কু-চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

একাকি থাকবে না

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মেয়েদের জন্য একাকি না থাকা উচিত। এবং ঘুম ছাড়া কাথা বা কম্বলের নীচে যাবে না। শয়তান বলে যে, আমি আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যেই সমস্ত বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করি তন্মধ্যে একটি হল যখন মানুষ ঘুম ছাড়া কাথার নীচে শয়ন করে, তখন আমি তার মাথায় বিভিন্ন খারাপ চিন্তা ঢুকিয়ে দেই এবং তাকে গোনাহের দিকে ধাবিত হতে উৎসাহিত করি।

ইস্তিগফার এবং জিকির বেশী বেশী করা উচিত

যখন আপনার মস্তিস্কে বিভিন্ন কু-চিন্তা আসবে তখনই ইস্তিগফার পড়বেন। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে মানুষ থেকে দূর করে দেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ নিঃসন্দেহে ঐ সমস্ত লোক যারা ভয় পেয়ে যায়, যখন তাদেরকে শয়তানের একটি দল বেষ্টন করে ফেলে, কিন্তু তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে তখন তারা এ বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। লক্ষ্য করুন! যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, তো আল্লাহ তায়ালা

তাকে এমন অন্তদৃষ্টি দান করেন যদ্ধরুণ সে শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালার সামনে উপস্থিত হওয়াকে মাথায় রাখবে

যদি অনেক বেশী ভ্রান্ত ধারণা ও কু-চিন্তা দিলে আসে তখন একটু চিন্তা করবে যে, কিয়ামতের দিন তো আমাকে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে উপস্থিত হতে হবে। হাদিছের মাফহুম হচ্ছে যে, যেই নারী পর্দাহীনতায় নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার সামনে দিয়ে যাবেন কিন্তু তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। ولا ينظر إليهم সে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা যাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না। লক্ষ্য করুন! এটা মানুষের জন্য কত বড় মসীবতের বিষয়! যা শুধুমাত্র একটি গোনাহের কারণে হচ্ছে।

যিনা ঋণ স্বরূপ

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, যিনা এমন গোনাহ যা মানুষের উপর ঋণ থেকে যায়। এই কারণেই যদি কোনো নারী এই গোনাহ করে থাকে তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার বংশধরের মধ্যে কেউ না কেউ এই গোনাহ করবে। যদি কোনো স্বামী এই গোনাহ করে থাকে তবে তার জেনে রাখা চাই যে, আমি যেহেতু এই গোনাহ করেছি তাই আমার ঘরের স্ত্রী, সন্তান, বা বোন কেউ না কেউ এটা করবে। হাদিসে এটাও এসেছে যে, যদি তোমরা (স্বামীরা) স্বীয় স্ত্রীদের পবিত্র রাখ, তবে লোকেরা তাদের থেকে দূরে থাকবে। আর যদি তোমরা যিনায় লিপ্ত হয়ে যাও তবে জেনে রাখ! তোমাদের ঘরেও কারো না কারো যিনা করা হবে। তো ভালো করে লক্ষ্য করুন, যে, রাসূল সা. কিভাবে এই কথা বলেছেন যে, তোমরা যিনা করলে তার বিপরীত তোমার ঘরের কারো সাথে যিনা করা হবে। এই কারণে এই গান্দেগী জীবনের গোনাহ থেকে বিরত থাকা চাই। নচেৎ একটি ভুলের কারণে বংশ খারাপ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এই সমস্ত গোনাহ থেকে বেঁচে থেকে পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন।

পুরুষ-মহিলার জিহাদ

একটা তো পুরুষের জিহাদ তথা ময়দানে গিয়ে দুশমনদের সাথে জিহাদ করা। আরেকটি হল মহিলার জিহাদ যা ঘরে বসে হয়ে থাকে তা নিজের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের থেকে জিহাদ করার বাইয়াত গ্রহণ করেছেন আর মহিলাদের থেকে ইজ্জত ও পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার বাইয়াত গ্রহণ করলেন। যেমন কুরআনে এসেছে ولا يزين (তারা যিনা না করে)। সুতরাং,

❖ মুজাহিদের জিহাদ ঘরের বাহিরে আর নারীর জিহাদ ঘরের ভিতর।

❖ মুজাহিদের জিহাদ কাফের দুশমনের সাথে পক্ষান্তরে নারীর জিহাদ গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে।

❖ দুশমন মুজাহিদের উপর গুলি বর্ষণ করে পক্ষান্তরে গাইরে মাহরাম নারীদের কাছে ম্যাসেজ পাঠায় পক্ষান্তরে কু-দৃষ্টি দেয়।

❖ দুশমন মুজাহিদের মালিকানাভুক্ত আসবাব দ্বারা উপকৃত হতে চায় পক্ষান্তরে গাইরে মাহরাম নারীর দেহের কোমলতা থেকে মজা নিতে চায়।

❖ মুজাহিদ দুশমনকে মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র ইঞ্চি লুণ্ঠন করতে দেয় না, পক্ষান্তরে নারী পর-পুরুষকে তার শরীর টাচ করতে অনুমোদন দেয় না।

❖ মুজাহিদ দুশমনের উপর ভরসা করে না, আর নারী পর-পুরুষের উপর ভরসা করে না।

❖ মুজাহিদ রণক্ষেত্র থেকে দুশমন প্রতিহত করে পক্ষান্তরে নারী ঘরের চার দেয়ালের থেকে নিজেকে সংবরণ করে।

❖ মুজাহিদ মনে করে যে, দুশমন আমাকে দেখে ফেললে আমার জীবননাশের আশংকা রয়েছে পক্ষান্তরে নারী মনে করে যে, আমাকে গাইরে মাহরাম দেখে ফেললে আমার ইজ্জত-আব্রু বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

❖ দুশমন মুজাহিদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চায় পক্ষান্তরে গাইরে মাহরাম নারীর ইজ্জত-আব্রু ছিনিয়ে নিতে চায়।

❖ মুজাহিদ দুশমনকে প্রতিহত করে গভীর ভূমিকা পালন করে আর নারী গাইরে মাহরামকে প্রতিহত করে আল্লাহ তায়ালার সামনে মুজাহিদাহ উপাধিতে ভূষিত হয়।

❖ মুজাহিদ দুশমন থেকে আত্মগোপন করে থাকে পক্ষান্তরে নারী গাইরে মাহরাম থেকে আত্মগোপন করে রাখে।

❖ মুজাহিদ দুশমন থেকে বাঁচার জন্যে লৌহ-বর্ম পরিধান করে এবং নারী পরপুরুষের কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে বোরকা পরিধান করে।

❖ মুজাহিদ দুশমনের সামনে অটল ও অবিচল থেকে আল্লাহ তায়ালার কামিয়াবী অর্জন করে পক্ষান্তরে নারী পরপুরুষের সামনে কঠোরতা দেখিয়ে আল্লাহ তায়ালার কামিয়াবী হাসিল করে।

❖ দুশমন মুজাহিদের সাথে কথা বললে এটাকে চক্রান্ত স্বরূপ ব্যবহার করে পক্ষান্তরে গাইরে মাহরাম ও নারীর সাথে কথা বললে এর পিছনে চাল-চক্রান্ত লুকিয়ে থাকে।

❖ দুশমন মুজাহিদের কাছে জাসুস-গুপ্তচর পাঠায় আর গাইরে মাহরাম নারীর কাছে চিঠিপত্র মেসেজ পাঠায়।

❖ দুশমন মুজাহিদের রাস্তায় গুলা-বারুদ ইত্যাদি বিছিয়ে কামিয়াব হয় পক্ষান্তরে গাইরে মাহরাম বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া উপঢৌকন পাঠিয়ে কামিয়াব হয়।

❖ মুজাহিদকে দিন-রাত সীমানা পাহারা দিতে হয় পক্ষান্তরে নারীকে দিন-রাত স্বীয় সম্ভ্রমের হেফাজত করতে হয়।

❖ মুজাহিদ দুশমনকে স্বীয় দূর্বলতা বুঝার সুযোগ দেয় না পক্ষান্তরে নারী পর্দার মাধ্যমে স্বীয় সৌন্দর্য পরপুরুষকে বুঝার সুযোগ দেয় না।

❖ মুজাহিদকে জিহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়, পক্ষান্তরে নারী স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করা ও আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তী করে দেয়।

❖ কোনো মুজাহিদ দুশমনের ব্যাপারে আশংকা করলে অপর মুমিন থেকে সে সাহায্য গ্রহণ করে পক্ষান্তরে নারী কোনো পরপুরুষের ব্যাপারে আশংকা করলে অপর মহিলা থেকে সাহায্য নেয়।

❖ দুশমন মুজাহিদকে স্বীয় হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য করে পক্ষান্তরে গাইরে মাহরাম নারীকে তার কাছে অর্পণ করতে বাধ্য করে।

❖ মুজাহিদ দুশমনের আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয় এবং নারী পরপুরুষের প্রস্তাবে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়।

❖ মুজাহিদের কাছে দেশ রক্ষা করা সবচেয়ে প্রিয় পক্ষান্তরে নারীর কাছে সম্ভ্রম রক্ষা করা সবচেয়ে প্রিয়।

❖ মুজাহিদের দোয়া আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন পক্ষান্তরে সম্ভ্রম রক্ষাকারী নারীর দোয়াও আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করেন।

❖ মুজাহিদ ভিতরগত দুশমনের ব্যাপারে খুব আতঙ্কিত থাকে পক্ষান্তরে নারী নিকটাত্মীয় পরপুরুষের ব্যাপারে খুব আতঙ্কিত থাকে ।

❖ মুজাহিদ দেশ রক্ষার জন্য মারা গেলে শহীদ বলা হয় পক্ষান্তরে নারী নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে মারা গেলে তাকেও আখেরাতের শহীদ বলা হয়।

❖ মুজাহিদের উচিত নিজের সফলতার জন্য দুআ করা, নারীর উচিত স্বীয় সম্ভ্রম হেফাজতের ক্ষেত্রে দুআ করা। মোটকথা, প্রমাণিত হল পুরুষ জিহাদ করে যে সওয়াব পায়, তেমনিভাবে নারী ঘরে বসে ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে সেই সওয়াব পায়।

এক যুবতী নারীর জিহাদের জযবা

প্রথম যুগে নারীদের ঈমান কত তাজা ছিল! সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তা'য়ালাকে রাযী খুশী করার জন্যে নিজেদেরকে আল্লাহর রাহে কতই না কুরবানী করত। আল্লামা বাক্বেরী একটি ঘটনা নকল করেছেন, যে, একদা রোমকরা হারুনুর রশীদের যামানায় কিছু মুসলিম নারীদেরকে গ্রেফতার করেছে। অতঃপর হারুনুর রশীদ রোমবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদেরকে প্রস্তুতি নেওয়ার ফরমান জারী করলেন। আর এক আলেম লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছিল। অতঃপর ঐ আলেম বলেন, যে, আমি লোকদের জিহাদের তারগীব ও উৎসাহ দিয়ে যখন আমার ঘরের

দিকে আসতে ছিলাম, পথিমধ্যে একটি নারীকে কারো জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম। যখন তার নিকটবর্তি হলাম আমার মনে হচ্ছিল সে আমাকে কিছু বলবে।

এই অবস্থা দেখে আমি তার সামনে দিয়ে অতি দ্রুত চলতে লাগলাম তাকে তোয়াক্কা না করে। তারপর মেয়েটি বলতে লাগল যে, নেক লোক কি এমন হয়, যে কারো কথা শুনে না? তখন আমি থেমে গেলাম এবং মনে করলাম যে সে হয়ত ভালো কিছু বলবে। অতঃপর তাকে বললাম যে, হে মেয়ে, তুমি আমাকে কি বলতে চাও? উত্তরে সে বলল, আপনিই কি জিহাদের তারগীব-উৎসাহ দিচ্ছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমিই। তারপর মেয়েটি বলল, আমার থেকে এই লৌহবর্ম ও থলিটি জিহাদের জন্য নিয়ে নেন। তারপর আমি যখন লৌহবর্ম নিয়ে পরলাম তখন এর উপর লেখা দেখতে পেলাম যে, আমি একাকি ঘরে থাকি। আমার তো জিহাদে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া আমার মাথায় চুল অতিরিক্ত লম্বা ছিল। তাই কিছু চুল কেটে ঐ থলিতে রেখে দিয়েছি, এগুলো দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত কোনো ঘোড়ার লাগাম বানিয়ে নিবেন। তখন আলেম লোকটি বললেন, আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, এক নারীর ভিতর কি পরিমাণ জযবা ও টান ছিল। মাথার চুল কেটেছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার লাগাম বানাতে। একটা সময় ছিল, যখন মহিলারা দ্বীনের জন্য নিজের সবকিছু কোরবান করে দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বর্তমান আমাদের নারীদের অবস্থা কেমন? একটু ভেবে দেখ ও পূর্ববর্তী নারীদের থেকে শিক্ষা নেয়া চাই।

গোনাহ্ থেকে যে বেঁচে যাবে তার ঠিকানা হবে জান্নাতে

আজকের আলোচনা একটি ঘটনা শুনিয়ে শেষ করে দিব। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সময় একজন গভর্নর ছিল। সে একদিন তার স্ত্রীর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে গোপন কথাবার্তায় মশগুল ছিল। কিন্তু কোনো কারণে স্ত্রী তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এখন স্বামী যতই তার সামনে ভালোবাসা প্রকাশ করে সে ততই ক্ষোভ প্রকাশ করে। একপর্যায়ে স্বামী অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রকাশ করলে তখন তার বোকা স্ত্রী তাকে বলতে লাগল, জাহান্নামী! আমার

থেকে দূর হও। আমার সাথে কথা বলবে না। জাহান্নামী বলার কারণে স্বামী রাগ করে বলে ফেলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যদি জাহান্নামী হই তবে তুই তালাক। অতঃপর সকাল হলে উভয়ে উভয়ের ভুল বুঝতে পেরেছে। স্ত্রীও অনুধাবন করতে পেরেছে, আসলে আমার পক্ষে জাহান্নামী বলা ঠিক হয় নি। তখন সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আমার তালাক হয়ে গেছে? তখন সে বলল, আমার শর্ত ছিল যে, যদি আমি জাহান্নামী হই। তাই আমাকে উলামায়ে কেরামদের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করতে হবে। তখন সে উলামায়ে কেরামদেরকে এর জন্য ডাকলে তারা বললেন, এর উত্তর তো আমরা দিতে পারব না। কারণ, কে এটা নিশ্চিতভাবে বলবে আপনি জাহান্নামী কিনা? এর ফয়সালা তো আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন করবে। তিনি সমস্ত উলামায়ে কেরামের কাছে এর ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউ মুখ খুলল না। গভর্নর খুব পেরেশান ছিলেন। কারণ, সে তার এত সুন্দরী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়নি, এবং তার স্ত্রী ও তার থেকে পৃথক হতে চায়নি।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী রহ. কে উক্ত ঘটনা শুনানো হলে তিনি বললেন, আমাকে ঐ এলাকায় নিয়ে চল। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব। অতঃপর তিনি ওখানে গেলে গভর্নরকে ঘটনাটি বলতে বললেন, ফলে গভর্নর ঘটনা বর্ণনা করে বলল যে, এবার বলুন তালাক হয়েছে কি? তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. বললেন যে, গভর্নর মহোদয়! আপনার সাথে আমার একটা পার্সোনাল কথা আছে। গভর্নর বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বললেন, আপনি আমাকে আপনার জীবনের এমন একটি কাহিনী শুনান, যাতে আপনার গোনাহ্ করার সুযোগ ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার ভয়ে তা ছেড়ে দিয়েছেন। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ বলতে লাগল যে, হ্যাঁ।

আমার জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। প্রশ্ন করা হল কিভাবে? উভয়ে বলতে লাগল, যে, একবার আমি আমার অফিসের কাজ দ্রুত শেষ করে বেডরুমে ঢুকলাম। ঢুকামাত্রই ওখানে একজন খুব সুন্দরী দেখতে পেলাম যে রুম পরিষ্কার করছিল। তখন তার সাজ ও সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করে ফেলল। একপর্যায়ে আমি মনের চাহিদা মিটানোর জন্যে দরজা লক করে

দিলাম । কিন্তু সে আমার খারাপি বুঝে ফেলে বলতে লাগল يا مالك اتق الله। বাদশাহ মহোদয়! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন আমার অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার হতে লাগল। একটু পর দরজা খুলে বললাম, যাও, চলে যাও। অথচ আমি চাইলে আমার মনের খাহেশাত পূরণ করতে পারতাম। কিন্তু মেয়েটির কথা আমাকে বিদ্যুতের মত শর্ট করেছে। অতঃপর আমি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়েই এই কাজটি করেছি, অন্য কারো জন্য না। তখন ইমাম শাফেয়ী ফতওয়া দিয়ে দিলেন যে, আপনার স্ত্রী জাহান্নামি নন বরং জান্নাতি। অতঃপর অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এই ফতওয়া শুনে তার সাথে বাক-বিতন্ডা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিল যে, আপনি কিভাবে এই ফতওয়া দিলেন? আপনার কাছে কি জান্নাতের টিকেট রয়েছে নাকি?

আপনার কাছে এমন কিছু নিদর্শন রয়েছে যদ্ধরুণ আপনি বলে দেন যে, এ জান্নাতি আর এ জাহান্নামী। উত্তরে তিনি বললেন, যে, এই ফতওয়া আমি আমার তরফ থেকে দেয়নি বরং কুরআনে কারীমে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন । প্রশ্ন করা হল কোথায় রয়েছে শুনি? তিনি বললেন, وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰى আর যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে, তো নিশ্চিত তার সর্বশেষ ঠিকানা হল জান্নাত। আর তিনি তো নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেছে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে, তাই আমি এই ফতওয়া দিয়েছি।

অতঃপর সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। এই কারণে আজ-কাল যেই বাচ্চা গোনাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বে ও নিজেকে আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে এর থেকে সংযত থাকবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাত দিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পবিত্রতার যিন্দেগী অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

মাগফিরাতের দশম শর্ত

আল্লাহর যিকির

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ . وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

এটি ২২পারার ২য় রুকুর আয়াত। এতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নারী পুরুষের মাগফিরাতের জন্য দশটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। এবং বিশাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তার মধ্য থেকে দশম শর্ত হল আল্লাহর যিকির। والذاكرين الله كثيرا والذاكرات অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারি পুরুষ ও নারী। যিকির শব্দটি কোরআন শরীফে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ং কোরআনুল কারীমের জন্যও যিকির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই আয়াতে যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর স্মরণ। সুতরাং যে সকল মহিলারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে তাদের মাঝে এই গুণটি বিদ্যমান।

যিকিরের দুই পদ্ধতি :

১. ذكر لسانی (যবানের যিকির)।

২. ذكر قلبی (অন্তর দ্বারা আল্লাহর স্মরণ)।

যবানের যিকির দ্বারা উদ্দেশ্যে হল, যবান দ্বারা আল্লাহর যিকির করা। উদাহরণস্বরূপ কিছু শব্দ মুখে উচ্চারণ করা। যেমন,

سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله

আর যিকরে কলবী হল অন্তর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা। হাদীস দ্বারা যিকরে কলবীর মর্যাদা যিকরে লিসানীর উপর সত্তর গুণ বেশী প্রমাণিত। তাই সর্বদা অন্তর দ্বারা আল্লাহর স্মরণ চেষ্টা করবে। হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু অন্তর থাকবে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত।

অন্তর আল্লাহর যিকিরের স্থান

চিন্তা করলে দেখা যায় যে যিকিরের স্থান হল কলব। আর ইহা এভাবে বুঝা যেতে পারে। কোনো সন্তান বিদেশ থেকে মায়ের সাথে যোগাযোগ করলে মা তাকে সর্বদা একথাই বলেই বলে যে, আমার অন্তরে তোমার কথা খুব স্মরণ হয়। সে একথা কখনোই বলে না যে আমার যবান তোমার খুব স্মরণ করে। সর্বদা একথাই বলে যে, আমার হৃদয় তোমার খুব স্মরণ করে। অতএব যিকিরের স্থান হৃদয়। যবান দ্বারা তার বহি:প্রকাশ ঘটে। তাহলে আপনারাও সর্বদা অন্তর দ্বারা আল্লাহর স্মরণের চেষ্টা করবেন। এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া যাবে না। আমাদের বুযুর্গরা বলেন, سودم غافل سودم کافر অর্থাৎ যে প্রশ্বাসটি উদাসীন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে সেটি কুফরী অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। বাস্তবে যাদের অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত আছে তারা এক মুহূর্তও আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে না।

যার ভালোবাসা সত্য সে কি কখনো অভিযোগ করতে পারে? যবানে নিশ্চুপ থাকার মহর থাকে, আর অন্তরে অন্তরে স্মরণ করতে থাকে। শুতে, বসতে, খেতে, চলতে, ফিরতে সর্বদা তার হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান থাকে। আমি সারাদিন অত্যাচারের শিকার হই তথাপি তোমার স্মরণ থেকে আমার অন্তর উদাসীন হই না।

যিকরী কলবীর দৃষ্টান্ত

তার উদাহরণ হল কোন একটি ছোট মেয়ে বালিকা স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কয়েকদিন সে খেয়ালে খুশি থাকে। মানুষের মজলিসে ও তার এই খিয়াল আসে, চলতে ফিরেত সর্বদা তার এই কল্পনা আসে, যে আমি পুরা স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। এরূপভাবে মুমিনের অন্তরে সর্বদা আল্লাহর স্মরণই বিদ্যমান থাকে। আর এটিই ذكر قلبى (যিকরে কলবী) ইবনে তাইমীয়া রহ: বলেন, الذكر للقلب كالماء للسمك মাছের জন্য যেমন পানি আবশ্যক অন্তরের জন্য আল্লাহর যিকির সদা সর্বদা বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য।

فَكَيْفَ يَكُوْنُ حال السَّمَكُ أن أُخرِجَ مِنَ الْمَاءِ

যদি পানি থেকে মাছ বের করে দেওয়া হয় তাহলে মাছের অবস্থা কী হবে? এমনই মুমিন বান্দা উদাসীন অবস্থায় আল্লাহর স্মরণের জন্য অস্থির হয়ে উঠে।

যিকিরের উপকারিতা

ইবনে কাইয়ুম রহ: তার الغافل السيل নামক গ্রন্থে যিকিরের নয়টি উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।

১. أنه قوت قلوب যিকির হৃদয়ের আহার।

২. أنه يطرد الشيطان যিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে।

৩. ويرضاه الرحمان যিকির দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

৪. يزيل الهم والغم من القلب যিকির অন্তরের দুশ্চিন্তাও পেরেশানি দূর করে। মানুষ যতই পেরেশানি এবং অস্থিরতায় (Depressed) থাকুক না কেন যদি আল্লাহর যিকির করে তাহলে পেরেশানি দূর হয়ে যাবে।

৫. يزلب الفرح যিকির দ্বারা আনন্দ লাভ হয়।

৬. ينور االقلب والوجه যিকির অন্তর ও চেহারাকে আলোকিত করে।

৭. يكس الذاكر اكمحوت والحلوت ونظره

যিকিরকারি বান্দার চেহারায় মিষ্টতা ও ভীতি ফুটে উঠে। যিকিরের নূর এমন, যে অন্তর শুধু তাকে দেখতেই চায়। যদি মহিলারা যিকিরের আধিক্যতার নূর সম্পর্কে জানতে পারত তবে তারা সবকিছু ভুলে যেত।

৮. يولسه محبة الله অধিক পরিমাণে যিকির করলে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বেড়ে যায়।

৯. ويحط الخطايا অধিক পরিমাণে যিকির করলে গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এই নয়টি ফায়দা হাফেজ ইবনুল কাইয়্যুম রহ. উল্লেখ করেছেন।

কোরআনের আলোকে যিকিরের ফায়দা

কোরআনে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, যে আল্লাহ তা'আলা যিকিরের অনেক ফায়দা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্য থেকে একটি ফায়দা হল এই أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ জেনে রাখ যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রাসাদ নির্মাণ, ধন-সম্পদ, দুনিয়াদারী দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয় না। আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হয়।

যিকিরের আরেকটি ফায়েদা
আল্লাহ বান্দাকে স্মরণ করেন

দ্বিতীয় ফায়দা হল فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আমাদের স্মরণ ও আল্লাহর স্মরণে পার্থক্য আছে। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বুঝা যেতে পারে। একটি ছেলে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করল, যে অফিসারের কাছে আবেদন করা হয়েছে সেই অফিসার ছেলের বাবার বন্ধু ছিল। বাবা ছেলের জন্য বন্ধুর কাছে সুপারিশ করল যে, আমার বাচ্চাকে নির্বাচন করে নিয়েন। ইন্টারভিউর দিন পুনরায় ফোন করে বন্ধুকে বলে দেয় আমাদেরকে স্মরণ রাখবেন। একথা বলার উদ্দেশ্য হল, আমাদের পক্ষে ফায়সালা করুন। আল্লাহর স্মরণও এমনই। فاذكرونى আমাকে স্মরণ কর। أذكركم আমিও তোমাদের স্মরণ করব। নতুন আমলের তাওফীক প্রদান করব। এর বিষয়বস্তু অনেক প্রশস্ত। হে বান্দা, তুমি আমাকে বিছানায় শুয়ে স্মরণ কর

আমি তোমাকে আরশ থেকে স্মরণ করব। তুমি লোকদের মজলিসে স্মরণ করলে, আমি তোমাকে ফেরেশতাদের মজলিসে স্মরণ করব। فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ তুমি আমার আনুগত্য করলে মাখলুকাতকে আমি তোমার আনুগত্য বানিয়ে দিব। তুমি অপারগতা প্রকাশ করে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে ক্ষমার সাথে স্মরণ করব। তুমি ইস্তিগফার পাঠ করলে আমি তোমার গুণাহ ক্ষমা করে দিব। তুমি পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে স্মরণ করব। তুমি সুখে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে দুখে স্মরণ করব। হে বান্দা, তুমি আমাকে নরম বিছানায় শুয়ে স্মরণ করলে আমি তোমাকে কবরে স্মরণ করব।

নামাযের মাকসাদ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (তোমরা আমার স্মরণে নামায কায়েম কর)

সুতরাং নামাজের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর স্মরণ। এই কারণে যে নামাযে আল্লাহর স্মরণ নেই তা নামাযই হতে পারে না। নামাযের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

আম্বিয়া আ. কে যিকিরের নির্দেশ

যিকির এমন আমল, আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া আ. কে এর প্রতি মনোনিবেশ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যখন মূসা ও হারুন আ. কে নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণ করার সময় নির্দেশ প্রদান করেছেন اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ হে মূসা, তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শন নিয়ে (বণী ইসরাইলের কাছে যাও) এবং আমার যিকিরের ক্ষেত্রে অলসতা করো না।

আল্লাহর স্মরণে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে

অধিক পরিমাণে যিকির করার দ্বারা মানুষ কল্যাণের অধিকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর যাতে সফলকাম হতে পার।

যিকির শয়তানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার

যখন শয়তান মানুষের উপর হামলা করে এবং গোনাহের অনুপ্রেরণা যোগায়, তখন যদি মানুষ আল্লাহর যিকির করে তাহলে তৎক্ষণাৎ শয়তান পালিয়ে যায়।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

(الأعراف: ٠)

মুত্তাকীদেরকে শয়তান ক্ষতি চাইলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে খুব বিনীতভাবে। সুতরাং যিকির মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার। এই কারণে শয়তানের প্রচেষ্টা হল, যেভাবেই হোক না কেন মানুষকে যিকির থেকে উদাসীন করতে হবে। কোন সৈন্য শত্রুর উপর বন্দুকের নল তাক করার দ্বারা মাকসাদ হল তুমি নত হয়ে যাও। তবে যদি শত্রুর হাতে হাতিয়ার থাকে সে মোকাবেলা করবে। শয়তানের বিষয়টি সম্পূর্ণ এমন, শয়তান ও আমাদেরকে যিকির থেকে উদাসীন বানাতে চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এই কারণে শয়তান মানুষকে প্রথমে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন বানায়, যখন যিকির থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন শয়তান তাকে নামায থেকেও গাফেল বানিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

শয়তান তোমাদের মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায

থেকে বিরত রাখতে চায়। আয়াতে প্রথমে যিকিরের কথা বলা হয়েছে। যিকির থেকে উদাসীন নামাযও পাবন্দির সাথে আদায় করা যায় না। যিকিরের পাবন্দীর একটি ফায়দা হল নামাযে পাবন্দী হওয়া যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে যিকির থেকে উদাসীন না বানায়। যারা ধন ও সন্তান সন্তুতির পিছনে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

বুদ্ধিমান লোক

কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বুদ্ধিমান বান্দার সিফাত এই,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে।

কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

তুমি অন্তরে তোমার প্রতিপালকের স্মরণ কর। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন أى فى قلبك স্বীয় অন্তর দ্বারা আল্লাহর স্মরণ কর। দেখুন কোরআনে আল্লাহ তা'আলা অন্তর দ্বারা স্মরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং লক্ষ্য করুন, বান্দার উপর আল্লাহর কত রহমত যে, যদি সে আল্লাহর স্মরণ করে তাহলে এই যিকিরের বরকতে সে আল্লাহর মহব্বত লাভ করবে এবং আল্লাহর মকবুল বান্দাদের কাতারে শামিল হবে।

অসংখ্য সওয়াবের যিকির

আজকের মজলিসে ছোট ছোট কিছু কালিমা নিয়ে আলোচনা করব, যার সওয়াব তথা প্রতিদানও উপকারিতা অনেক বেশী। আপনারা এর উপর আমল করার চেষ্টা করবেন। লক্ষ্য করুন এগুলো ছোট ছোট কালিমা কিন্তু আল্লাহর কাছে এর মূল্য অনেক বেশী। এর প্রতিদান অনেক বড়। কিছু কালিমা এমন যেগুলো বলার দ্বারা বান্দা তার গোনাহসমূহ মুছে ফেলে। কিছু কালিমার এমন প্রতিদান রয়েছে যে, ফেরেশতা প্রতিদান লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যায়। ঘরের মহিলাদের এসব কালিমা পাঠ করা উচিত। এর প্রতিদান পাহাড় সমপরিমাণ। ফেরেশতা এর সওয়াব লিখে ক্লান্ত হয়ে যায়। এই যিকিরের দুটি উপকারিতা রয়েছে। একটি হল কিয়ামত দিবসে সে নেক আমলের ভান্ডার পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় হল, নেক আমল করার কারণে গোনাহের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এটি কতইনা মজার বিষয়। এই কালিমাসমূহ প্রতিদিন পাঠ করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। যাতে প্রতিদিন সওয়াব পাওয়া যায়। প্রতিদিন আমলনামায় নেকী লেখা হয়।

ইস্তেগফার

এর মধ্যে থেকে প্রথম একটি আমল হল আস্তাগফিরুল্লাহ পড়া। আমাদের আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার উদ্দেশ্য হল হে আল্লাহ, আমি আমার গোনাহের উপর লজ্জিত হচ্ছি। আপনি আমার গোনাহ মাফ করে দিন। ইসতিগফারের একটি বড় ফযিলত হল এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। বান্দার উপর আযাব আসে না। গোনাহের কারণে বান্দা অপমানিত হয়। দুশমন বিজয় লাভ করে। ফলে রিযিক কমে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইসতিগফারের মাধ্যমে গোনাহের এ সকল ক্ষতি থেকে বান্দাকে বিরত রাখেন। প্রত্যেক মহিলাই কামনা করে যে, দুনিয়াতে আমি যেন অপমানিত না হই। গোনাহের কারণে আমার আকৃতি যেন বিকৃত না হয়ে যায়। তাই অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা চাই। আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে ইরশাদ ফরমান,

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِي هِمْ وَمَاكَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
(الأنفال :)

যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে থাকবেন আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি দিবেন না এবং তারা যতক্ষণ ইসতিগফার পড়বে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিবেন না।

এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর নবীর উপস্থিতির বরকতে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দূর করে দেন। ইসতিগফারের বরকতেও আল্লাহ তা'আলা শাস্তি হটিয়ে দেন। মক্কার লোকেরা নবী কারীম সা. কে বলত আমরা আপনার কথাকে অস্বীকার করছি তারপরও আমাদের উপর কেন আযাব আসছে না? মুফাসসীরীনে কেরাম তাদের উপর আযাব না আসার কারণ উল্লেখ করেছেন নবী কারীম সা. এর উপস্থিতি। প্রশ্ন হয় তাহলে হিজরতের পর কেন আযাব আসল না? উলামায়ে কেরাম এর উত্তর দিয়েছেন যে, কিছু সাহাবায়ে সেখানে ছিলেন, তাদের বরকতে আযাব আসেনি। প্রশ্ন হয় একপর্যায়ে তো সকল মুসলমান হিজরত করে মদিনায় চলে যান। তারপর আযাব আসল না কেন? মুফাসসীরীনে কেরাম এর উত্তর প্রদান করেছেন মুশরিকদের অভ্যাস ছিল তারা বায়তুল্লাহ তওয়াফ করার সময় বলত হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করে দিন। এই ইসতিগফারের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। মুশরিককে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। মুশরিককে আযাব থেকে রক্ষা করলে মুমিনের প্রতি আল্লাহর কি পরিমাণ মেহেরবান হবেন? তাই অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পাঠ করতে হবে। সকাল বিকাল দিনে কমপক্ষে একশবার পড়তে হবে। বেশী বেশী পড়তে হবে। কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে পড়তে হবে। অধিক ইসতিগফারের মাধ্যমে দুটি ফায়দা হবে। একটি ফায়দা হল গুণাহ মুছে যাবে, অপরটি হল শাস্তি হটে যাবে।

কোরআনে ইসতিগফারের ফায়দা :

কোরআনে এসেছে অধিক পরিমাণে ইসতিগফারকারী ব্যক্তি পাঁচটি উপকার লাভ করবে।

১। استغفروا ربكم إِنَّه كَانَ غَفَّارًا (نوح : ١٠) যে ইসতিগফার করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

২। يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا যেখানে অধিক পরিমাণে ইসতিগফার পাঠ করা হয় সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

৩। يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ইসতিগফারকারীদের মাল আল্লাহ তা'আলা বাড়িয়ে দেন।

৪। وبَنِيْنَ যে বেশী যিকির করে আমি তাকে পুত্র সন্তান দান করি। এমন কোন মহিলা নেই যে পুত্র সন্তানের কামনা করে না। প্রত্যেক মহিলাই চায় তার পুত্রের নিয়ামত লাভ হোক। বেশী বেশী যিকির করলে আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

৫। وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ তোমাদেরকে বাগ-বাগিচা দান করবেন।

৬।وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا তোমাদের জন্য নদী নালা প্রবাহিত করবেন।

প্রত্যেকেই ইসতিগফার করা উচিত

আমাদের অধিক পরিমাণে ইসতিগফার করা উচিত। প্রত্যেকেরই ইসতিগফার করা উচিত। নেককার হোক বা বদকার হোক, এ কারণেই কাফের কুফর থেকে তওবা করবে। সাধারণ মুসলমান গোনাহ থেকে তওবা করবে। যদি কেউ বলে আমার অন্তর গাফেল থাকে না, তাহলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে ইসতিগফার করবে। যদি বলে শয়তান আমাকে ধোঁকা দেয় না, তাহলে ইখলাসের কমতির জন্য ইসতিগফার। সুতরাং ইসতিগফার করার দ্বারা শাস্তি থেকে নিরাপদ হওয়া যায়, গোনাহ মাফ হয়, আল্লাহর সাহায্য আসে, রিযিকে বরকত হয়, এবং সন্তান সন্তুতিতে বরকত হয়। তাই অধিক পরিমাণে ইসতিগফার করুন। কোন ঝাঁড় ফুঁককারীর কাছে তন্ত্র-মন্ত্রের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কাজকর্মের পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবো। সন্তানের পেরেশানি হলেও ইসতিগফারের মাধ্যমে খতম হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সন্তান-সন্তুতির মাধ্যমে

সাহায্য করবো। যদি কারো কাজকর্ম না থাকে বাগানে ফল দান করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা দোকানের মাধ্যমেও তাকে ফল দান করবেন। কাজকর্ম ভালো চলবে। এক ইসতিগফারের কারণে আমাদের জীবনের কত সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

الحمد لله বলে আল্লাহর শোকর আদায় করা মানুষের জীবনে কখনো সুখ আসবে, কখনো দুঃখ আসে। কাজ-কর্ম কখনো তার অনুকূলে হয় আবার কখনো তার প্রতিকূলে হয়। যদি কাজ কর্ম তার অনুকূলে যায়, তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। শোকর আদায়ের আসল তরিকা হলো যবান দ্বারা الحمدلله বলা। প্রতিটি নিয়ামতের ক্ষেত্রেই আমাদের শোকরিয়া আদায় করা চাই। শোকরিয়া আদায়ের ফলাফল এই হবে, যে নিয়ামত স্থায়ি হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে, আমি তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দিব।

শোকরের অসংখ্য ক্ষেত্র

উদাহরণস্বরূপ অসংখ্য কাজ আমাদের মর্জি মোতাবেক হয়ে থাকে। তাই নিঃশব্দে আল্লাহর শোকর আদায় করে নিতে হবে। কোন কর্মে الحمد لله বললে আল্লাহর শুকরিয়া হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ যখন আপনার যেহেনে আসল যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ঈমান নসিব করেছেন তাই الحمد لله বলুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুস্থতা দান করেছেন তাই বলুন الحمدلله। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সম্মানের জীবন যাপন করার তৌফিক দিয়েছেন এই কথা স্মরণ করে বলুন الحمد لله। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান দান করেছেন তাদের প্রতি দৃষ্টি পড়লে বলুন الحمدلله। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মাথা গোঁজার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাই ঘরের দিকে তাকিয়ে বলুন الحمد لله। যদি আপনার সন্তান স্কুল থেকে নিরাপদে সুন্দরভাবে ফিরে আসে তার দিকে তাকিয়ে বলুন الحمدلله সময়মতো কাপড় ধুয়ে পরিস্কার করতে পারলে বলুন الحمدلله। সময়মত খাবার রান্না হয়ে গেলে বলুন الحمد لله।

যদি আপনার ঘরের মেহমান খুশিতে ফিরে যায় তবে বলুন الحمدلله। সময়মত নামাজ পড়ার তৌফিক হলে বলুন الحمدلله। সময়মত তিলাওয়াত, যিকির আযকার, মোরাকাবা পাবন্দী করতে পারলে বলুন الحمدلله। যদি আপনি একদিন বেপর্দা থেকে বেঁচে যান পর্দার খেয়াল রাখতে পারেন, তবে বলুন الحمدلله। যদি কাউকে কষ্ট না দিয়ে থাকেন তবে বলুন الحمدلله। তাই কোনো কাজ আপনার আশানুকূলে হলে আপনি বলুন الحمدلله। তাহলে শোকরকারি বান্দাদের মধ্যে শামিল হবেন। আপনার অন্তর আনন্দিত ও খুশিতে থাকলে বলুন الحمدلله। আপনার স্বামী ঘরে এসে আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলে আপনি বলুন الحمد لله। আপনার সন্তানকে খুশীতে খেলা করতে দেখলে বলুন الحمدلله। কোনদিন আপনার শ্বশুর আপনার সাথে বিরূপ আচরণ না করলে আপনি বলুন الحمدلله। আর কোনদিন ননদ আপনাকে বিরক্ত না করলে বলুন الحمدلله। কোন ভুল হয়ে গেলে বলুন الحمدلله শোয়ার পর সুখ নিদ্রায় চলে আসলে বলুন الحمدلله। ক্ষুধা লাগার পর পেট ভরে খেতে পারলে খাওয়ার পর বলুন الحمدلله। পিপাসার্ত হয়ে ঠান্ডা পানি পান করার পর বলুন الحمدلله। নরম বিছানায় শোয়ার আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দিয়েছেন তাই শোয়ার সময় বলুন الحمدلله। এখন চিন্তা করুন আমার তো মনে হয় সর্বদাই আমাদের الحمدلله বলা উচিত। অনেক মহিলা দিনে একবারও الحمدلله বলে না। তবে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তৌফিক দেন তাদের কথা ভিন্ন। তাই চিন্তা করুন! আমরা কতই না অলসতার জীবন পার করছি, প্রতিটি মুহূর্তে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা চাই। অথচ আমাদের এ বিষয়ে কোন অনুভূতি নেই, আমরা আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করছি, যার এসকল নিয়ামত নেই, তাকে জিজ্ঞাস করে দেখো যে মেয়ের বিবাহ হচ্ছে না তাকে প্রশ্ন করে দেখো তার অন্তরে কত ব্যথা! অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মহব্বতকারী স্বামী মিলিয়ে দিয়েছেন, তাহলে আপনি কেন الحمدلله বলছেন না? দিনে একশবার الحمدلله বলার অভ্যাস করতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ে الحمدلله বলবে।

শোকর দ্বারা আল্লাহর শাস্তি দূর হয়ে যায়

শোকর করার দ্বারা প্রথমত নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত ফায়দা হলো আল্লাহর আযাব দূর হয়ে যায়। যেমন ইস্তেগফার করার দ্বারা আযাব দূর হয়। কোরআন থেকে শুনুন–

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

হে আমার ঈমানদার বান্দারা! যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, ঈমান আন তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাস্তি দিয়ে কি করবেন? ইস্তিগফার দ্বারা আজাব দূর হয়, শোকরিয়া আদায় করার দ্বারাও আজাব দূর হয়ে যায়। দেখুন কত ছোট বিষয় কিন্তু ফায়দা কত বড়। আল্লাহু আকবার। লক্ষ্য করুন, আজ আমি আপনাদের মণিমুক্তা উপহার দিচ্ছি।

জান্নাতীদের কালিমা

'আলহামদুলিল্লাহ' এত সুন্দর একটি কালিমা যে, যারা জান্নাতে যাবে তারা বলবে আলহামদুলিল্লাহ।

وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

জান্নাতিরা জান্নাতে সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ' আর বর্তমানে দুনিয়াতেও জান্নাতীদের কাজ করছে। তাই আল্লাহর শোকরিয়া ও অধিক পরিমাণে الحمد لله শব্দ ব্যবহার করতে হবে। ইহাকে জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নিতে হবে। সবসময় কোন নিয়ামত পেলে الحمد لله বলব।

(৩) ধৈর্য

তৃতীয় বিষয় হল ধৈর্যধারণ করা, কিছু বিষয় বান্দার ইচ্ছার প্রতিকূলে হয়ে থাকে। এই অবস্থায় অস্থিরতা প্রকাশ না করাকে ধৈর্য বলে। যদি বান্দা চুপ থেকে মেনে নেয় এবং মনে করে যে এই বিষয়টি যেন হওয়ারই ছিল না অর্থাৎ অস্থিরতা ও অভিযোগ না করে তাকেই صبر ধৈর্য বলে। তাই জীবনে কোনো অনাকাঙ্খিত বিষয়ের সম্মুখীন হলে চুপ থেকে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছ থেকে ধৈর্যের প্রতিদান নিয়ে নিবে। ধৈর্যের কারণে মানুষ অসংখ্য সওয়াব লাভ করে থাকে।

ধৈর্যের ক্ষেত্রসমূহ

আপনি ঘরে বসে বিজলির আওয়াজ শুনে إِنَّاللهِ وانا إليه راجعون পাঠ করলে সওয়াব পেয়ে যাবেন। কেননা আপনি অভিযোগ করেননি, কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্যধারণ করেছেন। যদি স্বামী শুধু শুধু আপনার সাথে রাগ করে তখন আপনি যদি চিন্তা করেন, যে আমি তার সেবাও করবো আবার তার তিরস্কার শুনবো, তা হতে পারে না, তাহলে তো সংসার চলবে না। আর যদি আপনি তিরস্কার শুনে চুপ থেকে মনে করেন যে, কিছুই হয়নি, তবে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবেন। যদি শাশুড়ি কোনো দিন কোনো বিরূপ আচরণ করে আপনি চুপ থাকবেন। যদি আপনাকে তিরস্কার করে আপনি মনে করবেন যেন কিছুই বলেনি। কখনো কখনো মেয়েরা খুব স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। সামান্য একটু ধমকিও তারা সহ্য করতে পারে না।

সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন, কখনো প্রতিকূল অবস্থা, কখনো অনুকূল অবস্থা হয়ে থাকে। যদি কোনো কাজ ইচ্ছার মুওয়াফীক হয় তবে শোকরিয়া আদায় করবে, অন্যথায় (সবর) ধৈর্যধারণ করবে। এরদ্বারা সওয়াব হাসিল হবে। আর কোন কাজ ইচ্ছার প্রতিকূলে হলে (সবর) ধৈর্যধারণ করবে। উদাহরণস্বরূপ আপনি স্বামীকে বললেন অমুক জিনিস শেষ হয়ে গেছে, ঘরে আসার সময় নিয়ে আসবেন। অথবা বললেন, বাচ্চার জন্য অমুক জিনিস নিয়ে আসবেন, কিন্তু স্বামীর বেপরোয়া তাই ইচ্ছার বিপরীত হওয়ায় রাগ করবে না, অভিযোগ করবে না, বরং ধৈর্যধারণ করবেন এবং একথার চিন্তা করবেন যে আমার জন্য এটিই আল্লাহর ফয়সালা ছিল। তাই এর জন্য কোন সমস্যা হবে না।

ধৈর্যশীল বান্দা আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে

একটি সূক্ষ্ম বিষয় শুনুন! আপনি শশুরালয়ে থাকাকালে স্বামী আপনাকে তিরস্কার করার পিছনে বাস্তবে অন্য কোন রহস্য থাকে। হতে পারে স্বামীর পিছনে তার মা কিংবা বাবা বড় ভাই বা অন্য কেউ কাজ করে থাকে। যে কারণে খামাখাহ সে স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে। তাই যদি স্বামীর পিছনে অন্যের

হাত থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তার আশ্রয়াস্থল হয়ে যাবে। হাদীসের অর্থও ইহাই, যে বান্দা সবর করবে আল্লাহ তা'আলা তার আশ্রয়স্থল হয়ে যান। শাশুড়ী আপনাকে এই কারণেই কিছু বলে যে, পুত্রের উপর তার অধিকার আছে।

এসকল ক্ষেত্রে সকলেই চিন্তা করে যে আমার সাথে কেউ আছে। অতএব আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন, আল্লাহ আপনার সাথী হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যার সাথে থাকবে সে সম্মান পাবে, তার পাল্লা ভারী হবে। সবর একটি উত্তম আমল, যার দ্বারা আপনি শশুরালয়ে সম্মান পাবেন। পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, অসংখ্য সওয়াব পাবেন। إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ বলুন, ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। তাই বলুন, যখন বিনা হিসাবে প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন তো ফেরেশতা সওয়াব লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাবে কী যাবে না? অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে আপনি নেকিতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু আপনার খবরও নেই যে আপনি কত প্রতিদান থেকে মাহরুম হচ্ছেন।

ধৈর্যশীলদের জন্য ফেরেশতার সহযোগিতা

একটি হাদীস শুনুন! নবী কারীম সা. তাশরীফ আনলেন। সিদ্দীকে আকবর রাযি. বসা ছিলেন। এক লোক এসে সিদ্দীকে আকবর রাযি. এর কাছে কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে লাগল। লোকটি এসে আবু বকর রাযি. এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল, তিনি চুপ থাকলেন। যখন সে সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন। যখনই উত্তর দিলেন নবী কারীম সা. উঠে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তিনি জিজ্ঞাস করলেন হে আল্লাহর নবী! আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? নবী কারীম সা. বললেন, হে আবু বকর! যখন লোকটি তোমাকে খারাপ কথা বলছিল, আর তুমি চুপ করে ধৈর্যসহকারে শুনছিলে, তখন একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে তোমার পক্ষ থেকে উত্তর প্রদান করছিল। আর যখন তুমি উত্তর দেওয়া শুরু করেছো ফেরেশতা উঠে চলে গেছে, তাই আমিও চলে যাচ্ছি।

চুপ থাকাই উত্তম জওয়াব

লক্ষ্য করুন! কেউ আপনাকে কটু কথা বললে আপনার ধৈর্যধারণ করা উচিত। তাহলে ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করবেন। কখনো নিজেকে নিরুপায় মনে করবেন না। যে আমার মা-বাবা আমাকে কেমন স্থানে বিবাহ দিয়েছেন। তাদের মাঝে আমি এ কি দেখছে? তারা ত আমাকে গর্তে ফেলে দিয়েছে। এভাবে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। যা ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে। বিবাহ শাদীর ভাগ্য নির্ধারণ এখানে হয় না বরং তা আসমান থেকে হয়ে থাকে। তাই এ অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়ে ধৈর্যধারণ করে চুপ থাকলে আল্লাহ তা'আলা বেহিসাব প্রতিদান প্রদান করবেন। আপনি এ বিষয়টি বুঝতে পারলে অন্য কেউ আপনাকে কষ্ট দিলে, আপনার কাছে ভালো লাগবে, যে সে এরকম বলে কষ্ট দিচ্ছে আর আমি চুপ থাকছি। এর বিনিময়ে আমার আমল নামায় এত পরিমাণ প্রতিদান লেখা হচ্ছে যে ফেরেশতা পর্যন্ত লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তাই পেরেশানীতে থেকে ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। যেসকল মেয়েদের খিটেখিটে স্বভাব, তারা সব বিষয়ে উত্তর দিয়ে দেয়। অথচ সব কথা এমন নয়, যার উত্তর প্রদান করা গ্রহণযোগ্য বরং কখনো কখনো চুপ থাকাই উত্তম জওয়াব হয়ে থাকে। মা আপনাকে কোন বিষয়ে তিরস্কার করেছিল, আপনি মায়ের সামনে যবান খুলবেন না; বরং চুপ থেকে প্রতিদান হাসিল করবেন। এর দুটি ফায়দা হবে। একটি হল মা পরে চিন্তা করবে যে আমি তাকে অযথা তিরস্কার করেছি। এতে করে মায়ের আপনার প্রতি আরও বেশী মেহেরবানি বৃদ্ধি হবে।

দ্বিতীয় ফায়দা হল ফেরেশতা নেকী লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাই চিন্তা করবেন যে আমি কোন গোনাহ করে ফেলেছি, যার কারণে আমার আমলনামায় পাপ লেখা হবে। তাই চলুন এমন নেক কাজ করি যার আলো আমার অন্ধকার দূর করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা কোরআন মাজীদে ইরশাদ ফরমান- إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط নিশ্চয় পূন্য পাপসমূহকে মোচন করে দেয়।

(৪) দুরুদ শরীফ

চতুর্থ বিষয় হল, দরুদ শরীফের পাবন্দী করা। একারণে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যে, সুন্নতের অনুসরণ বেশী করবে এবং দরুদ শরীফের যত বেশী পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে নবী কারীম সা. এর ততবেশী নৈকট্য হাসিল করবে। লক্ষ্য করুন এ দুটি বিষয় কত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা খেতে, বসতে, উঠতে শুতে, সব কাজে সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখব। আর দ্বিতীয় বিষয় অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করা। এই দুটি বিষয়ে যত গুরুত্ব দিবে, কিয়ামতের দিন নবী কারীম সা.-এর এত নৈকট্য লাভ করা যাবে। এক হাদীসে এসেছে অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠকারী লোক কিয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া পাবে।

এই মাসআলা জেনে নিন, যে ঈমানদারের জন্য জীবনে একবার দুরুদ পাঠ করা ফরয। যে মজলিসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা হবে সে মজলিসে একবার দুরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। প্রতিবার পড়া মুস্তাহাব। তাই উত্তম হল, নবী কারীম সা. এর নাম শুনামাত্রই দরুদ পাঠ করে নেওয়া। কিছু লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের সাথে صلى الله عليه وسلم পূর্ণ লেখে না বরং ص এর চিহ্ন দিয়ে দেয়, এটি যথেষ্ট নয়। পরিপূর্ণভাবে লেখা উচিত। আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনামাত্রই পূর্ণ দরুদ শরীফ صلى الله عليه وسلم পাঠ করবেন। এক লোক কিতাব লিখত। নবী কারীম সা. এর নাম আসলে পূর্ণ দরুদ শরীফ লিখত। এই কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ঐ বছরের গোনাহ মাফ

এক হাদীসে এসেছে, যদি কোন বান্দা ইখলাসের সাথে দুরুদ শরীফ পাঠ করে আর তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ বছরের গোনহ মাফ করে দিবেন। দেখুন লাইলাতুল কদরের ঐ বছরের ইবাদতের সওয়াব পাবে। একবারের দুরূদ শরীফ কবুল হয়ে গেলে এক

বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কয়েকবার মহিলারা প্রশ্ন করেছে, হযরত! মার ইন্তিকাল হয়েছে তাকে স্বপ্ন দেখছি না। কোন আমল বলে দিন যার দ্বারা মাকে স্বপ্ন দেখতে পারব। তাহলে শুনুন, যদি মানুষ চার রাকাত নফল নামায পড়েন, এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা তাকাসূর পড়ে, তারপর দুরুদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যায়। চল্লিশ দিন এমন করলে মাকে স্বপ্নে দেখতে চাইলে তাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে। এটি হযরত হাসান বসরী রা. এর বাতলানো আমল, এবং উম্মতের লাখো মাশায়েখের পরীক্ষীত ও সত্যায়িত আমল।

জুমার দিনে বেশী বেশী দুরুদ পাঠ করা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা জুমার দিনে অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ কর। উলামায়ে কেরাম লিখিছেন, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তিনশত বার, মধ্যম পরিমাণ হল এক হাজার বার। বেশীর পরিমাণ হল তিন হাজার বার। তাই মহিলারা জুমার দিন পরিপাটি হয়ে সুন্দর কাপড় পরে নামায আদায় করবে এবং সর্বনিম্ন তিনশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

সকাল-সন্ধ্যা একশত বার

দুরূদ পড়ার ফযীলত

এক বর্ণনায় এসেছে যে লোক দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার একশটি প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ত্রিশটি দুনিয়াতে, আর সত্তরটি আখেরাতে। তাই সকালে একশতবার পাঠ করলে ত্রিশটি, সন্ধ্যায় পাঠ করলে ত্রিশটি, মোট ষাটটি পার্থিব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে।

আমার দৃষ্টিতে সারাদিন পাঁচ থেকে দশের উপর কোন কাজই হয় না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ষাটটি প্রয়োজন পূরণ করার যিম্মাদারী নিয়েছেন। অতএব জানা গেল যদি আমরা দিনে একবার রাতে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করি, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাজসমূহের সংশোধনের যিম্মাদারী নিয়েছেন।

হাজার বার দুরূদের ফযীলত

এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি এক হাজার দুরূদ পাঠ করবে, জান্নাতের ঠিকানা না দেখে তার মৃত্যু হবে না। যেসকল বৃদ্ধারা ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে সময় কাটায়, তারা কি এক হাজার বার দুরূদ পড়তে পারে না? যুবতী মেয়েরাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়তে পারে এটি তো আগ্রহের বিষয়।

হিসাব ছাড়া সওয়াব

নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান, যে একটি দরূদ শরীফ হল جَزَ اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهٗ যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে এই পরিমাণ প্রতিদান পাবে যে ফেরেশতারা তার প্রতিদান লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

দুরূদ শরীফ নবী কারীম সা. এর কাছে পৌছানো হয়।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যে এখানে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তা পৌছে দেন। আল্লাহর নেযাম হল, কেউ দুরূদ

শরীফ পাঠ করলে তৎক্ষণাৎ স্পেশাল ফ্লাইটে নবী কারীম সা. এর কাছে Message (পয়গাম) পাঠিয়ে দেব। হাদীসে এসেছে, যে দুরূদ পাঠকারীর নাম, তার পিতার নাম সহকারে নবী কারীম সা. এর খেদমতে পেশ করা হয়। সুবহানাল্লাহ! এক দুরূদের কারণে কত সৌভাগ্য হাসিল হয়। এমন ও ঘটনা আছে যে যারা অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ করেন, তারা স্বপ্নে নবী কারীম সা. এর যিয়ারত লাভ করবেন।

নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান, তোমরা অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ কর, আমি তোমাদের মুখে চুম্বন করব। নবী কারীম সা. তার মুখে চুম্বন করেছেন। এক সপ্তাহ পর্যন্ত তার কামরা সুগন্ধিময় ছিল।

নবী কারীম সা. এর রওযায় উপস্থিত হয়ে, তার অভিমুখী হয়ে দুরূদ পাঠ করার আকাঙ্খা রাখতে হবে। নবী কারীম সা. ইরশাদ ফরমান, যে আমার কাছে এসে দুরূদ পড়ে আমি নিজেই তার উত্তর প্রদান করে থাকি। কবি বলেন, তুমি মদীনায় এসে মৃত্যুবরণ কর।

মদীনায় গিয়ে শুধু চক্কর দিয়ে ফিরে আসো না। মন চায় সেখানে বাসস্থান বানাতে। এটিই আমার আকাঙ্খা এটিই আমার বাসনা। ইহা শোনতেই আমার মন চাই। তোমার পায়ে আমার মাথা রেখে গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে আমার মন চায়। তাই কমপক্ষে তাকে ভালোবেসে, দুরূদ পড়ে তার সুন্নতের অনুসরণ করে, এখানে থেকেও সেই সওয়াব পাওয়া যাবে, যা সেখানে গিয়ে পাওয়া যায়।

যার অন্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা আছে, সে যেখানেই থাকুক না কেন সে যেন মদিনায়ই রয়েছে। কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, সময় খুব কম। অতএব চতুর্থ আমল হল অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ করা।

(৫) সুবহানাল্লাহ বলা

পঞ্চম আমলটি হাদীসে এসেছে।

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

দু'টি কালিমা রহমানের কাছে প্রিয়, যবানে হালকা মীযানের পাল্লায় ভারি سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم মাহবুব শব্দটি অন্তরে শীতলতা এনে দেয়। এক হাদীসের মর্ম অনুযায়ী যে ব্যক্তি দিনে একশ বার سبحان الله وبحمده বলবে আল্লাহ তা'আলা তার পুরা জীবনের গোনাহ মাফ করে দিবেন, তাই চাই গোনাহ সমূদ্র পরিমাণ হোক। একশত বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ বললে যদি গোনাহ মাফ হয়ে যায়, তাহলে চিন্তা করুন سبحان الله العَظِيْمِ বলার দ্বারা হাসিল হবে? উলামায়ে লেখেন যার গোনাহ মাফ হয়ে যায়, سبحان الله العَظِيْمِ বলার দ্বারা ঐ পরিমাণ অর্থাৎ সমুদ্র পরিমাণ নেকি তার হাসিল হবে। তাই দেখুন, এমন প্রতিদান যা লিখতে লিখতে ফেরেশতা ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

(৬) تعوذ আউযুবিল্লাহ্ পড়া

সর্বশেষ বিষয় أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এটি একটি বড় বরকতের কালিমা। যা মানুষকে শয়তান ও সকল প্রকার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়, এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে আশ্রয় দেন। তাই যখনই আপনি কোন বিপদে পড়েবেন, যেমন স্বামীর তিরস্কার, শাশুড়ীর নিকট অপমানিত হওয়া, কোন ক্ষতি হওয়া, সন্তান অবাধ্য হওয়া বা কারো অসন্তুষ্ট হওয়ার ভয়, তখনই তা পাঠ করবেন। যখনই অন্তরে কোন শংকা লাগবে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়ে নিবে। আল্লাহ তা'আলা আপনার অন্তর থেকে সেই শংকা দূর করে দিবেন। এগুলো অল্প কিছু আমল যদি আপনারা পাবন্দীর সাথে আদায় করেন, আমলনামা নেকি দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে। আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে আপনি শামিল হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অধিক পরিমাণে যিকির করার তাওফীক দান করুন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

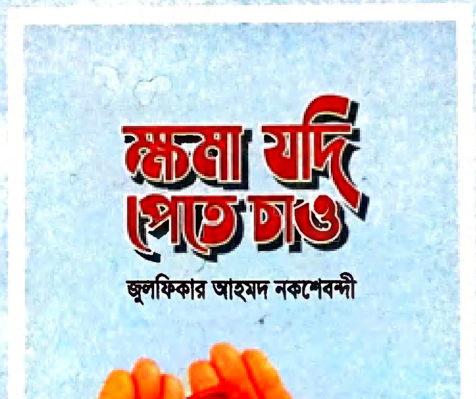

The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767586

মাহ্‌মুদিয়া লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০